
অভীক দত্ত

দ্য রেড বুক ২

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

The Red Book 2

By

Abhik Dutta

প্রচ্ছদ শিল্পী- তৌসিফ হক

https ://iwrite.app

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম।
হিন্দু বাড়িতে যাত্রা গান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম
জারি গান, বাউল গান
আনন্দের তুফান
গাইয়া সারি গান নৌকা দৌড়াইতাম।
বর্ষা যখন হইত,
গাজির গান আইত,
রংগে ঢংগে গাইত
আনন্দ পাইতাম
কে হবে মেম্বার,
কে বা সরকার
আমরা কি তার খবরও লইতাম
হায়রে আমরা কি তার খবরও লইতাম।
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।
করি যে ভাবনা
সেই দিন আর পাব নাহ
ছিল বাসনা সুখি হইতাম
দিন হইতে দিন
আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম...
....
শাহ আবদুল করিম

এই উপন্যাসের স্থান, কাল, পাত্র, ঘটনা, চরিত্র সব কাল্পনিক। বাস্তবের সঙ্গে কোন কিছুর কোন মিল নেই

১।

মল্লিকপুর গ্রাম।

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাটে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন।

এককালে পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। এখন হেরে গেছেন।

প্রভাসের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় প্রতি বছর। এবছরও হবে।

পার্টিতে এই নিয়ে কম নিন্দা হয় নি। প্রভাস শোনেন নি। বাপ পিতামহর পুজো। যতই কমিউনিস্ট পার্টি করুন, পুজোর ক'টা দিন নিষ্ঠা সহকারে পুজো না করলে কেমন অস্বস্তি হয়।

যখন ক্ষমতায় ছিলেন, পুজোর কাজের লোকের অভাব ছিল না। এখন নিজেকে যেতে হবে।

সে যেতে হলে হবে। পুজো কিছুতেই আটকানো যাবে না। বাড়ির পুজো মানে বিরাট ব্যাপার।

জোগার যন্তর করতে হবে অনেক।

বাইকটা বের করে রতনকে ডাকলেন। ছেলেটা মুনিষ খাটে অনেক দিন ধরেই। তার কথা শুনে চলে। অনেকেই তার বাড়ি আসা বন্ধ করেছে। রতন করে নি।

গাড়িতে উঠে রতন বলল, "আব্দুলদা জিজ্ঞেস করল পুজো হচ্ছে নাকি এবার?"

প্রভাস ভ্রূ কুঁচকালেন, "কেন? হবে না কেন? তুই কিছু বলিস নি?"

রতন বলল, "আমি কী বলব দাদা? শুধু বললাম হবে"।

আব্দুল দল পাল্টেছে। তার দলেই ছিল। এখন শাসক দলে। প্রতিবারই আসে পুজোয়। পুজোর কাজেও হাত লাগায়। এরকম প্রশ্ন করল কেন, বুঝলেন না।

মাঠের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করতে হয়। প্রভাস বাইক নিয়ে সে রাস্তাতেই গেলেন। এ বছর সেরকম বৃষ্টি হয় নি বলে যাওয়া যাচ্ছে। নইলে যাওয়া এত সোজা না। মাঠে কাদা থাকলে বাইক আটকে যায়। তখন ইটের রাস্তার পথ ধরতে হয়। ইটের রাস্তা দিয়ে গেলে অনেকটা বেশি যেতে হবে।

প্রভাস বাইকের স্পিড বাড়ালেন। আগে প্রতিমা আনার ভ্যানের ব্যবস্থা করে তারপর দশকর্মা ভাণ্ডারে যেতে হবে। প্রচুর জিনিস নেওয়ার আছে।

মাঠের মধ্যে জটলা হয়েছে কিছু নিয়ে।

প্রভাস বললেন, "কী ব্যাপার রে?"

রতন বলল, "বুঝছি না"।

খানিকটা এগোলে দেখা গেল জটলায় আব্দুলও আছে। কী মনে হতে প্রভাস বাইক দাঁড় করিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার রে আব্দুল?"

আব্দুল বলল, "পঞ্চায়েতের কিছু কাজ আছে"।

প্রভাস বললেন, "হ্যাঁ, তা সে আমাকে বলা যাবে না?"

আব্দুলের সঙ্গে বেশ কয়েকজন শাসক দলের লোকও ছিল। একজন খানিকটা রাগী গলাতেই বলল, "যে কাজে যাচ্ছো, সে কাজে যাও, এত কথার কী আছে?"

প্রভাস বরাবরই ডাকাবুকো। বাইক দাঁড় করালেন।

রতন বলল, "দাদা, চলুন না। খামোখা ঝামেলা করার কী আছে?"

প্রভাস রতনের কথা কানে না দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কথার কী আছে মানে? কথা বলার অধিকারও কেড়ে নিয়েছো নাকি?"

আব্দুল বলল, "প্রভাসদা তুমি যাও না। ঝামেলা কোর না"।

প্রভাস বললেন, "আমি তো ঝামেলা করার জন্য কিছু বলি নি। আমি একটা সামান্য কথা তোকে জিজ্ঞেস করলাম। এরা তার মধ্যে থেকে কথা বলছে কেন? নতুন নতুন নেতা হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে নাকি?"

আব্দুল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল।

সে বলতে পারল না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা লাঠির বাড়ি প্রভাসের মাথায় এসে পড়ল।
প্রভাস জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।
রতন হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। রতনকে চার পাঁচজন ঘিরে ধরে বেধড়ক মারতে শুরু করল।
আব্দুল একবার ক্ষীণস্বরে বাধা দিতে গেছিল, কেউ শুনল না।
কিছুক্ষণ পর মাঠের মধ্যে প্রভাসের যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলেন রতন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার নিজের মাথাতেও চাপ চাপ ব্যথা।
ঠেললেন। রতন সাড়া দিল না।
কোন মতে বাইক স্টার্ট করে বাড়ি এসে প্রভাস দেখলেন পুলিশ তার বাড়ি ঘিরে নিয়েছে।
তারা জানাল রতনকে খুনের অভিযোগে প্রভাসকে গ্রেফতার করা হল।
প্রভাস অবাক গলায় বললেন, "মানে? আমি খুন করতে পারি? সেটা আপনারা বিশ্বাস করেন?"
ওসি বললেন, "গাড়িতে উঠুন। আপনাকে যাতে ঠিক ঠাক রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি"।
প্রভাস বললেন, "দুদিন পর পুজো। এখন মিথ্যা অভিযোগে আমাকে গ্রেফতার করবেন? খুনটা তো আমি করি নি। আমি আপনাদের কাছেই যাচ্ছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। দেখুন, আমার মাথায় মেরেছে, এখনো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। তদন্ত করুন, সব প্রমাণিত হবে"।
ওসি বললেন, "সময় নষ্ট না করে গাড়িতে উঠুন"।
প্রভাস শূন্য দৃষ্টিতে ওসির দিকে তাকালেন। তিনি যখন প্রধান ছিলেন এই লোকটাই কেমন ভাবে কথা বলত।
ক্ষমতার বদল সবাইকে কীভাবে পাল্টে দেয়!
২।
যশোর রোড দিয়ে গাড়ি চলছে। ড্রাইভারের পাশের সিটে সিকিউরিটি গার্ড বসে।
প্রত্যুষ তার কন্সটিটুয়েন্সির একটা গ্রামে পুজো উদ্বোধনে যাচ্ছেন। ফোন এসেছে। এলাকার নেতা সুভাষ পাল ফোন করছে। এও আগে কমিউনিস্ট পার্টিতেই ছিল।
প্রত্যুষ ধরলেন, "বল রে"।
সুভাষ বলল, "দাদা তাড়াতাড়ি আসুন। দেরী করছেন কেন?"
প্রত্যুষ বিরক্ত গলায় বললেন, "লুডো খেলছিলাম তো, তাই দেরী হয়ে গেল। কেন কী হয়েছে?"
সুভাষ দুর্বল গলায় বলল, "দাদা এরকম করে বলছেন কেন? জানেনই তো এ দলে আমার কোন জোর নেই। যারা আগে দল করত তারা প্রায়ই কথা শুনায়। আপনি এলে তাও খানিকটা জোর হয়। ঠারে ঠোরে তো কম কথা শুনতে হয় না"।
প্রত্যুষ ঘড়ি দেখে বললেন, "আর মিনিট কুড়ি লাগবে। ভাবিস না, আসছি"।
সুভাষ বলল, "আচ্ছা দাদা"।
গ্রামের মাঝখানে পুজো উপলক্ষ্যে বড় মেলা বসেছে। প্রত্যুষ গাড়ি থেকে নামতে সুভাষ ছুটে এল। সঙ্গে বেশ কয়েকজন স্থানীয় নেতাও। প্রত্যুষ সুভাষকে বললেন, "সব ঠিক আছে তো?"
সুভাষ বলল, "হ্যাঁ দাদা, এই তো, সব ঠিক আছে। চলুন, স্টেজে চলুন"।
স্টেজের মধ্যে দলের কর্ণধারের বড় ছবি। এখন এটাই রীতি। যাই হবে, তা সবই অনুপ্রেরণায় হবে।
কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দল বদল করার অনেকগুলো সমস্যা আছে। বক্তৃতায় এখনো লাল সেলাম বেরিয়ে যায়। সংগ্রামী অভিনন্দন, "ইনক্লাব" জিন্দাবাদ বেরিয়ে যায়। এ দল কমিউনিস্ট পার্টি না। জাতীয়তাবাদী দল। স্লোগান আলাদা। বন্দেমাতরমের সঙ্গে অন্য স্লোগান দিতে হয়। আগের দলে থাকতে প্রত্যুষই বিভিন্ন

বক্তৃতায় একে "যাত্রাদলের স্লোগান" বলে ব্যঙ্গ করেছেন। এখন সেই স্লোগানই আবেগঘন গলায় দেওয়া প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে।
মঞ্চে উঠতে উঠতে সুভাষ বলল, "দাদা, পঞ্চায়েতে আমাকে একটা পদ দেওয়ার কথা ভাবুন। কাজ না করতে পারলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়"।
প্রত্যুষ বললেন, "কাজ না করতে পারলে, না টাকা না মারতে পারলে? শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পার্টি এক্সপেল করেছিল না তোকে?"
সুভাষ জিভ কেটে চারদিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ভাল হয়ে গেছি দাদা। ওই জন্য তো দলটা ছেড়েছি। এই দলে সব সাদা। নীল আর সাদা। কোন দুর্নীতি নেই। প্লিজ দাদা। দেখুন না"।
প্রত্যুষ মাথা নেড়ে স্টেজে উঠলেন। স্থানীয় নেতারা সংবর্ধনা জানালেন। পরিচিত অপরিচিত মুখ স্টেজে বসে। কেউ আগের দলে ছিল, কেউ উঠতি। এখনকার শাসকদল যারা আগে করত তারা বেশিরভাগই কোণঠাসা। দলে রোজ রোজ নতুন নতুন লোক যোগ দিচ্ছে। দেশের সব থেকে লাভজনক ব্যবসা এখন রাজনীতি।
ভাষণে বক্তব্য কম, অনুপ্রেরণা বেশি। প্রত্যুষ সেই ছকে খানিকটা বলে একবার ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলতে গিয়ে কোনমতে নিজেকে আটকালেন।
বক্তব্য শেষে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের পাশে বসে বললেন, "সুভাষ পালকে একটু দেখবেন। আমার লোক। পারলে কিছু একটা পদ দিয়ে দেবেন। তরুণ তুর্কী। ওকে তোলা দরকার"।
পঞ্চায়েত প্রধান বললেন, "আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয়ই দেখব দাদা। তবে সুভাষকে নিয়ে অনেকের অভিযোগ আছে"।
প্রত্যুষ বললেন, "অভিযোগ স্বয়ং ভগবানকে নিয়েও থাকে। অত সব ভাবলে হবে না। পুজো বড় করে করুন। সুভাষকে কাজে লাগান। দলেরই লাভ হবে। আরেকটা দল এখন মুছে গেছে। আমাদের দলকে বড় করতে হলে অত বাছ বিছার করলে হবে না"।
প্রধান আর কিছু বললেন না। প্রত্যুষ বড় পদে আছেন। অনেক কিছু বলার থাকলেও চুপ করে যেতে হয়।
এ আমলে আরেকটা ব্যাপারও আছে। মঞ্চ ভর্তি লোক। ছোট, মাঝারি, সেজো, মেজো, বড় নেতা ভর্তি। কেউ কাউকে জায়গা ছাড়ে না। প্রত্যুষ কোন কোন জায়গায় গিয়ে ভয় পান লোকের চাপে স্টেজ না ভেঙে পড়ে।
কমিউনিস্ট পার্টিতেও শেষ দিকে জালি লোক ভর্তি হয়ে গেছিল। তারাই এখন সময় বুঝে জার্সি পালটেছে।
স্টেজ থেকে নামার সময় সুভাষ বলল, "গাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট, ফুল সব তুলে দিয়েছি দাদা। আর একটা ছোট ব্যাগ দিলাম। দেখবেন"।
প্রত্যুষ বললেন, "তোর কথা বলেছি। দেখছে বলল"।
সুভাষ হাত জোড় করল, "বাঁচালেন দাদা। কাজ ছাড়া আমি..."
প্রত্যুষ হাঁটতে হাঁটতে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সুভাষ বশংবদের মত গোটা রাস্তা সঙ্গী হয়ে রইল।
৩।
"দিদি একটা সেল্ফি তুলব?"
প্রশ্নটা শুনে রাগ হল খানিকটা সোহিনীর। সেলফি তুলে তুলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক' দিন ধরে। শ্যুটিং সামলে, প্রোডাকশান সামলে যেভাবে এলাকা সামলাতে হচ্ছে সেটা ভাবা যায় না। অথচ বলা হয়েছিল কিচ্ছু করতে হবে না। সব নাকি পার্টিকর্মীরা দেখে নেবে। দলে দুর্নীতিবাজ এতো বেড়ে গেছে যে তাদের মত ফিল্মস্টারদের এখন রাজনীতিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। এতে একইসঙ্গে দুটো কাজ হচ্ছে। রাজনীতিতে ফ্রেশ মুখ আসছে। অলরেডি এসটাব্লিশড লোক আসায় দলের ফেস ভ্যালু বাড়ছে।
সঞ্জীবের কথা শুনে সোহিনী বলল, "তুলুন।"

সঞ্জীব তার একটা এলাকা দেখে। এলাকার রাস্তাঘাট নাকি খুবই খারাপ। ট্যুইটারে তাকে ট্যাগ করে করে লোকেরা নালিশ করছে। কেউ কেউ বাজে ট্রলও করে। মাঝে মাঝে মাথায় রক্ত উঠে যায়। ইচ্ছা করে এদের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আসতে। শেষতক হয় না বটে কিন্তু কোনদিন সুযোগ পেলে সোহিনী তাই করত।
সোহিনী বলল, "তিনটে রাস্তা খারাপ আছে। ঠিক করার জন্য কী করতে হবে?"
সঞ্জীব বুঝদারের মত বলল, "ওসব বিরোধী অধ্যুষিত এলাকা দিদি। ঠিক করতে হবে না"।
সোহিনী অবাক হল, " এরকম হয় নাকি?"
সঞ্জীব বলল, "এটাই তো পলিটিক্স। সবখানেই হয়"।
সোহিনী বলল, " রাস্তাটা হলে তো আমরা কিছু ভোট বেশি পেতে পারি?"
সঞ্জীব জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "কিচ্ছু হয় না দিদি। বিশ্বাস করুন। মানুষ হেবি হারামি"।
" হারামি" শব্দটা উচ্চারণ করে সঞ্জীব জিভ কাটল।
সোহিনী বলল, "শোন, আমার কাছে বার বার ওই রাস্তাগুলো করার জন্য রিকোয়েস্ট আসছে। ওগুলো ঠিক করার ব্যবস্থা কর"।
সঞ্জীব ব্যাজার মুখে ডায়েরিতে সেটা লিখে বলল, " আমাদের লোকাল পার্টি খুশি হবে না"।
সোহিনী বলল, " না হলে না হবে। পরে কথা বলে নেব"।
সঞ্জীব বলল, "বলছি আসছে কুড়ি তারিখ এলাকায় আসতে পারবেন? একটা শোরুম উদ্বোধন আছে"।
সোহিনী বলল, "আমি অস্ট্রিয়া যাব পনেরোতে। ফিরব ছাব্বিশে। হবে না"।
সঞ্জীব সেটাও ডায়েরীতে লিখে বলল " আসছি দিদি"।
সোহিনী বলল, "ঠিক আছে।"
সঞ্জীব চলে যেতে রুম ছেড়ে বেরোল সোহিনী। সারাদিন শ্যুটিং আছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝেই এলাকা থেকে ফোন আসছে। ভোটের প্রচারের সময় বিভিন্ন নেতাকে নাম্বার দেওয়া হয়েছিল। জেতার পরে তাদের কাছে সে নাম্বার থেকে গেছে। কারণে অকারণে ফোন করা তাদের অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। কোথায় কী কাজ করবে সে ব্যাপারে অকারণ প্রশ্ন করে যায়। সোহিনী আজকাল ঠিক করেছে এই ফোন নাম্বারগুলো চিহ্নিত করে ব্লক করে দেবে। যে কাজগুলো তাকে ছাড়াও করা সম্ভব, মানুষ সেটা বোঝে না। ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে বাড়ি থেকে বার বার বারণ করেছিল কিন্তু জলে থেকে কি আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়?
বার দুয়েক অনুরোধ করেছিল সে। লাভ হয় নি। কেরিয়রের মাঝপথে রাজনীতিতে আসার ইচ্ছে ছিল না একবারেই। সব থেকে বড় কথা, রাজনীতিতে এলে বিরোধী ফ্যান বেসটা নষ্ট হয়ে যায় এটা তার শুভানুধ্যায়ীরা বলেছিল। তাছাড়া সব টাকা তো সিনেমা থেকে তোলা সম্ভব হয় না। গ্রামে গঞ্জে টাকা নিয়ে স্টেজ শো করতে যেতে হত। একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে সেসব করতে কোথায় একটা তার বাধো বাধো লাগে।
জেতার পরে এই ভয়গুলো প্রায় সবই সত্যি হচ্ছে। শ্যুটিং এ ঠিক করে মনোযোগও দেওয়া যায় না। ভেতরে ভেতরে একটা নিরাপত্তাহীনতা কাজ করে সোহিনীর। গ্রহণযোগ্যতা যদি সত্যি সেভাবে কমে যায়, তাহলে এর পরে কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। রাজনীতিবিদ হওয়া তো কোন কালে তার অ্যাম্বিশন ছিল না। একপ্রকার জোর করেই আনা হল তাকে।
মেক আপ রুমের দিকে রওনা দিল সোহিনী। যে যাই বলুক, আবার অভিনয়ে মন দিতে হবে।
অভিনয় বাদ দিয়ে সে বাঁচবে না। কিছুতেই না।

৪।

ভাইফোঁটার দুদিন পরে জামিন পেয়ে গ্রামে ফিরেছেন প্রভাস। কেস চলছে। আপাতত জামিন পাওয়া গেছে।
প্রভাসের স্ত্রী অমলা রান্না করে রেখেছিলেন। পেঁপের তরকারি আর রুটি।

অমলা বললেন, “অর্ণব আর পিউ প্রায়ই ফোন করে খোঁজ নিয়েছে। আজকেও নিয়েছে। পারলে একবার ফোন কোর”।
পিউ প্রভাসের মেয়ে। অর্ণব পিউর বর।
প্রভাস ক্লান্ত গলায় বললেন, “আজ ইচ্ছা করছে না। কাল করব”।
অমলা বললেন, “তাই কোর। তোমাকে শুধু জানিয়ে রাখলাম”।
প্রভাস মাথা নাড়লেন।
অমলা বললেন, “গ্রামের সবাই জানে কাজটা তুমি কর নি। পুরোটাই যে সাজানো, সবাই সব জানে”।
প্রভাস অমলার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাতে কী হয়? লজ্জাটা কি আর কোন দিন দূর হবে?”
অমলা চুপ করে গেলেন। প্রভাস খেয়ে উঠে নিজের ঘরে গেলেন। অমলা গলা তুললেন, “তুমি একা শোবে?”
প্রভাস বললেন, “হ্যাঁ। পড়াশুনা আছে কিছু। কালকে উকিলের সঙ্গে বসব একবার”।
অমলা আর কিছু বললেন না।
প্রভাস জানলা খুললেন।
শহরে থাকলে হেমন্তকাল বোঝা সম্ভব না। গ্রামে বোঝা যায়। শীত পড়ছে, তবু পড়ে নি। আলগা কুয়াশার আস্তরণ পড়তে শুরু করে। চারদিক অন্ধকার। কিছুক্ষণ জানলা খুলে খাটের তলা থেকে দড়ির বস্তাটা বের করলেন প্রভাস। ফ্যানের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। হিসেব করলেন কতটা দড়ি দরকার পড়বে।
খাটের পাশে পোস্টারের বান্ডিল রাখা। “লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই”।
মাথার মধ্যে কথাগুলো পাক দিতে শুরু করল, “লড়াই লড়াই লড়াই চাই...”
লড়াই? পার্টির কেউ সেভাবে যোগাযোগ করে নি। নিজেকেই সব করতে হচ্ছে। জলের মত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে।
কেস সাজানো এত সোজা? এভাবে দমন করা যায়?
নিজের মনে হাসলেন প্রভাস। দড়ির বস্তাটাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখলেন আবার।
অমলা দরজা ধাক্কালেন।
প্রভাস দরজা খুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।
অমলা বললেন, “আব্দুল এসেছে”।
প্রভাস বললেন, “পাঠিয়ে দাও”।
কয়েক মিনিট পরে আব্দুল প্রভাসের ঘরের ভিতর এসে বলল, “সব ঠিক আছে?”
প্রভাস বললেন, “কীভাবে ঠিক থাকবে? আমার উপর কার এত রাগ?”
আব্দুল বলল, “রাগ কী না জানি না, তবে আমার মনে হয় সেদিন ওরা রতনকে একেবারে মেরে ফেলতে চায় নি। যেটা হয়েছে, বেশি উত্তেজনার ফলে হয়েছে”।
প্রভাস বললেন, “বাহাত্তর সাল পার করা লোক আমি আব্দুল। আমাকে এসব বুঝিয়ে লাভ আছে? যে পার্টি করেছিস, আর যে পার্টি করছিস, পার্থক্য বুঝছিস?”
আব্দুল কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়ে বলল, “ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই। আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমাদের দলে চলে এসো। কেস সরে যেতে কোন সমস্যা হবে না আর”।
প্রভাস আব্দুলের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, “এই জন্যই তোরা কেসটা খাওয়ালি আমায়? রতনটা কী দোষ করেছিল আব্দুল?”
আব্দুল আপত্তি করে উঠল, “কোন কেস খাওয়ানো হয় নি। বলছি শোন...”
প্রভাস বললেন, “কিছু বলার দরকার নেই। তুই যা”।

আব্দুল বলল, “আমি চেষ্টা করছিলাম। হয়ে যেত। কেস হালকা করাটা কোন ব্যাপার না আমি বলছি শোন”।
প্রভাস বলল, “ফাঁসি হবে? হোক। মাথা নোয়াতে শিখিনি, মাথা নোয়াবো না। তোদের দলকে বলে দিস, যা করার করে নিক। জেলে দিক, ফাঁসি দিক, যাবজ্জীবন হোক, আন্দামান পাঠাক, যা পারে করে নিক। আমি মাথা নিচু করব না। তুই যা এখন”।
আব্দুল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে উঠল।
প্রভাস বললেন, “আজকাল আয়নায় মুখ দেখিস আব্দুল? লজ্জা লাগে না?”
আব্দুল বলল, “আসি। খেয়াল রেখো নিজের”।
প্রভাস কথা বললেন না। আব্দুক বেরিয়ে গেল।
প্রভাস ফোন বের করে আমিনুল হাসানকে ফোন করলেন। আমিনুল জেলা সেক্রেটারি।
ফোন ধরে আমিনুল বললেন, “বল কমরেড। কী খবর?”
প্রভাস বললেন, “ভালো উকিল পাওয়া যাবে? ওরা তো ধীরে ধীরে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে আমাকে। উকিল খরচও অনেক এখন”।
আমিনুল বললেন, “পার্টির কাছে আর টাকা কোথায় কমরেড? পার্টি এখন গরীব হয়ে গেছে”।
প্রভাস বললেন, “অনেক লেভির টাকা পার্টি নিয়েছে। তার থেকে কিছুই কি এখন করা যায় না?
আমিনুল ব্যস্তভাবে বললেন, “আমি দেখছি”।
ফোনটা কেটে গেল।
প্রভাস আবার আমিনুলকে ফোন করলেন। এবারে রিং হয়ে গেল। আমিনুল ফোন ধরলেন না।
প্রভাস গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।
৫।
“দিন এখন আগের মত নেই দাদা। পঞ্চায়েত বল, মিউনিসিপ্যালিটি বল, করপোরেশন বল, আগের আমল হলে টাকা পেতে মাথা খারাপ হয়ে যেত। তার হাজার কৈফিয়ত, হাজার ঝামেলা। আজকাল এত ঝামেলার কিছু নেই। টাকা আসছে, কাজ হচ্ছে কি না বড় কথা না, তবে টাকা আসছে”।
সুভাষ এসেছে সকাল সকাল। প্রথমে ভেবেছিলেন খেদিয়ে দেবেন। পরে কী মনে হতে বেডরুমে ডেকে পাঠিয়েছেন। চেয়ার নিয়ে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথাগুলো বলল সুভাষ।
প্রত্যুষ বিছানায় শুয়ে আছেন। বললেন, “সময় পাল্টাবে। চিরকাল একই সময় থাকবে সেটা ভাল না। তুই যেটা চেয়েছিলি সেটা তো হল, এখন কী ধান্দায় এসেছিস, সেটা বল”।
সুভাষ বলল, “দাদা, কী বলব? কিছু কথা বলব বলে ছুটে এলাম। মানে কী বল তো, আমি যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমাদের সময় দশ বিশ হাজার সরাতে আমাদের কত চিন্তা করতে হত, এখন এরা দেখি লাখের কমে কথাই বলে না। সব জায়গায় টাকা। মানে এতো লুট চলছে”!
প্রত্যুষ চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, “তাতে তোর কী? তুইও লুটে নে। অনেক তো আদর্শ কপচানো হল, তাতে কী লাভ হয়েছে? এত বছর ক্ষমতায় থেকেও অনেক গ্রামের রাস্তাই হল না। এদিকে বড় বড় বাতেলা মারা হল গ্রাম দিয়ে নাকি শহর ঘেরা হবে! তার থেকে কিছু লোকের পকেটে যাক, আর কিছু রাস্তা হোক। মানুষেরই লাভ হবে”।
সুভাষ বলল, “কার কী লাভ হবে বুঝছি না দাদা। আমি তোমাকে ছাড়া কাকেই বা বলব বল এসব? আমার অস্বস্তি হচ্ছে বলেই ছুটে এলাম”।
প্রত্যুষ বললেন, “তা যা করেছিস, ভাল করেছিস। এখন যা, আমাকে হাউজে বেরোতে হবে”।
সুভাষ বলল, “হ্যাঁ দাদা, তা যাও। বলছিলাম একটা দাবী নিয়ে এসেছি বলতে পারো”।
প্রত্যুষ বুঝলেন এবার ঝুলি থেকে বেড়াল বেরনোর সময় এসেছে। বললেন, “হু, বল কী দাবী”।

সুভাষ বলল, "বলছি দাদা, আমাদের লবিটা আমি স্ট্রং করছি। আমাকে এবার কোন ভাবে প্রধান করা যাবে না?"
প্রত্যুষ হেসে ফেললেন, বললেন, "শালা লাল পার্টি আর কিছু করুক না করুক, তোদের মত মাল পয়দা করে গেছে। এই সবে খেতে পেলি, এখনই শুতে চাইছিস?"
সুভাষ মাথা চুলকাল, "দাদা আমার উন্নতি হলে তো তোমারই লবি স্ট্রং হবে। দল পাল্টে এসেছো বলে কি সেই সম্মান পাও, নিজেই বল? আমার কাছেও কি খবরাখবর থাকে না? জানি না এ দলে কীভাবে তোমাকে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে? লোকে বলে একটাই নাকি পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট। বাকি নেতা মন্ত্রীরা থাকা আর না থাকা সমান। এ তো আর লাল পার্টি না যে লোকাল, জোনাল, জেলা, রাজ্য ভাগ ভাগ করে কাজ হবে। এখানে একজনই সব। তার গুডবুকে থাকতে হলে কী করতে হবে সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। আমি যে প্রস্তাবটা দিয়েছি, তাতে কি শুধু আমারই লাভ হবে?"
প্রত্যুষ বললেন, "ছাড়া গরু দেখেছিস তো? এখানে এসে আমাদের সেই অবস্থা হয়েছে। আগে হাগতে মুততে পার্টিকে জবাব দিতে হত। এখানে অত ঝামেলা নেই। তোরও অনেক উন্নতি হয়েছে বুঝতে পারছি। তা না হলে সরাসরি এখানে এসে এই প্রস্তাব রাখতিস না"।
সুভাষ বলল, "আমি শুধু বিবেচনায় রাখতে বললাম। এখন যে আছে, সে কিন্তু মৃণাল লবির লোক"।
প্রত্যুষ বললেন, "তা ঠিক, মৃণাল ঘুঘু মাল, তবে চিটফান্ড নিয়ে চাপে আছে। ওই তাসটুকুই যা আমার সম্বল। ঠিক আছে, আমার মাথায় থাকল তোর কথা। অনেক দূর থেকে এসেছিস, রুটি খেয়ে যাস"।
সুভাষ বলল, "মিষ্টি এনেছি দাদা, বউদিকে দিলাম। খেও কিন্তু"।
প্রত্যুষ হাসলেন, "ও ঘুষটা না আনলেও হত"।
সুভাষ পোষা কুকুরের মত মাথা নাড়ল, "ঘুষ কেন বলছ কেন, ভালবাসা বল"।
প্রত্যুষ বললেন, "হ্যাঁ ভালবাসায় উলটে দিচ্ছিস একবারে। যা খেয়ে নে যা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ছুঁচিয়ে দিবি?"
সুভাষ মুখটা এমন করল, যেন প্রত্যুষ রাজি থাকলে সেটাও করে দেবে...
৬।
"টাকার নেশা, মদের নেশা, মেয়ে মানুষের নেশার থেকেও বেশি নেশা কী?
আমরা রাজনীতির লোকেরা জানি সে নেশা কী!
সে নেশা হল ক্ষমতার নেশা। ক্ষমতা হল কোন নিরীহ বাঘকে নরখাদকে রূপান্তরিত করার নর-রক্ত। যে রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ নরখাদকে রূপান্তরিত হয়, রাজনীতিকদের কাছে ক্ষমতা হল সেই রক্ত। একবার রক্তের স্বাদ পেয়ে গেলে কেউ সে রক্তের লোভ ছাড়তে পারে না। কিছুতেই পারে না।
এ কারণেই শক্তির রূপান্তরের মত শাসক পাল্টালেও কিছু মানুষ শুধু মাত্র ক্ষমতায় থাকার জন্যই দল পাল্টে যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতায় থেকে যেতে চায়। মানুষ যাদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতার বদল চায়, শেষমেশ দেখা যায়, শুধু প্রতীকটাই বদলায়। শাসক সেই একই ব্যক্তি থেকে যায়। এ যেন গণতন্ত্রের সঙ্গে এক নিদারুণ প্রতারণা।
এ দেশের সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হল গণতন্ত্র।
এ দেশের সব থেকে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ হল গণতন্ত্র।
নেতাদের দলবদলের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা বোধ হয় সব থেকে বেশি দরকার। যেভাবে গরু ছাগল কেনার মত শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার জন্য এ দেশে এম এল এ, এম পি কেনা বেচা হয়, তা ভয়াবহ। কোন আদর্শকে বিশ্বাস করে মানুষ ভোট দেয়, ভোটের পরে দেখা যায়, যে আদর্শকে বিশ্বাস করে তারা ভোট দিয়েছিল, সে আদর্শ প্রচারকারী ভোটে জেতা মানুষটা দল পাল্টে ফেলল। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে

প্রবল রাজনীতি বিরোধী মানসিকতা তৈরী হয়ে যায়। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ দেশের শিক্ষিত প্রথম ভোটারদের অধিকাংশ ভোটার নোটাতে ভোট দিতে চাইছে। এই প্রবণতা মারাত্মক। কেন হবে এই প্রবণতা? এর দায় বর্ষীয়ান রাজনীতিকরা অস্বীকার করতে পারেন না। একটা সময় রাজনীতি করতে আসার মানে ছিল দেশ বদলের স্বপ্ন দেখা।
এখন রাজনীতি হয়ে উঠছে পকেট ভরার মাধ্যম। সর্বত্র ঘুষ, ক্ষয়ে যাওয়া একটা সিস্টেমের সর্বত্র ঘুণ ধরে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে গণতন্ত্র নামক বটগাছের ভিতটাকে উইপোকা খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে।
একটা মহল থেকে ক্রমাগত মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি ভাল জিনিস না।
ছাত্র রাজনীতি হল সেই রাজনীতি যেখানে একজন তরুণ বা তরুণী স্বপ্ন দেখবে দেশ পাল্টে দেওয়ার। সরাসরি চেয়ারকে প্রশ্ন করার স্পর্ধা হবে তার।
তরুণের স্পর্ধাকেই ভুল বুঝিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে।
অনেক বামপন্থীরা চীনকে মডেল হিসেবে দেখানোর কথা বলেন।
আমি তা মনে করি না।
আমি মনে করি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হবার পর যে গণতন্ত্রের মডেল আমরা পেয়েছিলাম, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দেশের সংবিধান বাকস্বাধীনতা দেয়, চেয়ারকে প্রশ্ন করার ঔদ্ধত্য দেয়, যেটা স্বাভাবিকভাবেই ফ্যাসিস্তের ভাল লাগার কথা নয়। তারা তাদের মত করে ব্রেইন ওয়াশ শুরু করে দেবে, মানুষকে বোঝানো শুরু করে দেবে, ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি ভাল জিনিস নয়।
মানুষ সেটাকে সমর্থনও করছেন। সেটা করারও কারণ আছে। যে রাজনীতিটাকে তারা এখন দেখছেন, তাতে রাজনীতিকে ঘেন্না করার যথেষ্ট কারণ আছে। একটা ঝড়ের পর গরীব মানুষের মাথার ছাদের টাকা মেরে যে রাজনীতিকরা তার বাড়ির তিনতলা বানান, সেই রাজনীতিকে সাধারণ মানুষকে কীভাবে পছন্দ করতে পারেন?
এই মুহূর্তে সবার আগে দরকার হল রাজনীতিকদের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা। যে দিল্লি আমার কাছে দূর অস্ত মনে হচ্ছে। আমি সর্বস্ব রাজনীতি, ঝুলি ভরে নেওয়ার রাজনীতিকে আবার নতুন করে প্রশ্ন করার দিন সমাগত। প্রয়োজন হলে জেল হবে, প্রয়োজন হলে মার খেতে হবে, প্রয়োজন হলে জলকামান বা টিয়ার গ্যাসের সামনে দাঁড়াতে হবে।
কিন্তু প্রশ্ন করে যেতে হবে।
এখন একটা নতুন শব্দের কথা শোনা যাচ্ছে খুব।
“দেশদ্রোহী”।
এই শব্দ আজকের শব্দ না। এই শব্দ আসলে প্রতিটা ফ্যাসিস্টের তৈরী করে দেওয়া যে কোন রকম বিপ্লবের গলা টিপে ধরার জন্য। প্রশ্ন করলে তোমাকে দেশ ছাড়তে হবে। প্রশ্ন করলে তুমি কারো না কারো দালাল।
দল, মত নির্বিশেষে এই প্রশ্ন করার অধিকারবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে।
কিন্তু কীভাবে?”
শেষ প্রশ্নটায় এসে লিখতে লিখতে তপন রায় নিজেই থমকে গেলেন।
তাই তো...
কীভাবে?
৭।
“তোকে নিয়ে একটা ফেসবুক পেজে কী সব লিখেছে দেখলাম”।
কস্তুরী বললেন।
সোহিনী বলল, “মা, তোমাকে তো বলেছি তুমি আমার রিলেটেড কোন নিউজ দেখো না”।

কস্তুরী বললেন, “এর থেকে তুই সাধারণ চাকরি করতিস, আমি খুশি হতাম। মানুষ সর্বক্ষণ যেন তোর পিছনে পড়ে আছে। ভাল লাগে কোন মায়ের? তুই আমার জায়গায় থাকলে কী করতিস?”
সোহিনী বলল, “সোশ্যাল নেটওয়ার্ক দেখা বন্ধ করে দিতাম”।
কস্তুরী বললেন, “তোর পলিটিক্সে যাওয়া উচিত হয় নি”।
সোহিনী শ্বাস ছেড়ে বলল, “আমি যেচে আসি নি মা। আমাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কিচ্ছু করার ছিল না। নইলে ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যেতাম। কেউ আর কাজ দিত না। এখানে ব্ল্যাক লিস্টেড হওয়া যে কত জ্বালা তা যদি তুমি বুঝতে”।
কস্তুরী বললেন, “আমার আর বুঝে কাজ নেই। তুই যতটা পারিস ধরি মাছ, না ছুঁই পানি করে থাকবি। বুঝেছিস? আমার ভারি চিন্তা হয়। এ জগতটা ভাল না”।
সোহিনী বলল, “ঠিক আছে মা। রাখি”।
ফোন রেখে সোহিনী মনে মনে বলল, “কোন জগতই মেয়েদের জন্য ভাল না মা। তুমি যদি জানতে একেকটা দিন কীভাবে কাটাতে হয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে, তাহলে শুধু রাজনীতির দোষ দিতে না”।
স্টুডিওতে বসে ছিল সোহিনী। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক হ্যান্ডেল আজকাল খুলতে ইচ্ছে করে না।
বেশ কয়েক ধরণের মানুষ আছে।
১) যারা মনে করে মেয়েদের দ্বারা কিছু হবার নয়।
২) যারা তার ফ্যান। সর্বক্ষণ ট্যাগ করে যাচ্ছে।
৩) যারা ক্রমাগত কুৎসিত মেসেজ পাঠিয়ে যাচ্ছে।
প্রথম প্রথম কেঁদে ভাসাত। এখন শক্ত হয়েছে। সাইবার সেল আছে ঠিকই, কিন্তু কত জনকে জেলে ভরবে? শুধু এ দেশ থেকে তো না, বাংলাদেশ থেকেও অনেক রকম কু ইঙ্গিতপূর্ণ মেসেজ আসে। সব কিছু ইগনোর করতে শিখতে হবে- নীলুদি বলেছিল।
নীলুদি তার স্কুলের সিনিয়র। বরাবরই সব কথা নীলুদির সঙ্গে শেয়ার করে সোহিনী। ইন্ডাস্ট্রির কাদা সোহিনীকে যত আঘাত করেছে, নীলুদিকে ততোবার ফোন করেছে সে। যখন, যেখানে, যে অবস্থাতেই থাকুক, নীলুদি ঠিক তার ফোন ধরেছে। তাকে শক্ত হতে সাহায্য করেছে।
বিপুলদা এসেছেন। ইন্ডাস্ট্রির অঘোষিত সর্বময় কর্তা এখন। মেক আপ রুমে ঢুকে বললেন, “তোমার সামনের সোমবার কী কাজ আছে?”
সোহিনী বলল, “শিডিউল দেখে বলতে হবে”।
বিপুলদা বললেন, “শ্যুটিং থাকলে রিশিডিউল করতে বলে দিও। মেদিনীপুর যেতে হবে”।
সোহিনী প্রথমে একবার ভাবল না করে দেয়। শেষ মেশ বলল না। এগুলো হল নির্দেশ। অমান্য করা মানেই হাজার খানেক ঝামেলায় পড়া। তাদের পদটা নামের। সব কিছু বকলমে বিপুলদার মত লোকেরাই চালায়। তার ভোটে দাঁড়ানো বা প্রচারে যাওয়া সব বিপুলদার নির্দেশেই হয়ে এসেছে বরাবর।
সে বলল, “ঠিক আছে”।
বিপুলদা চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে বললেন, “আর শোন, তুমি আপাতত প্রীতমের কোন ছবিতে কাজ করবে না। ফোরাম ওর নামে অভিযোগ জানিয়েছে। গুপী কেস করছিল। ধরা পড়ে গেছে”।
ইন্ডাস্ট্রিতে গুপী কেসটা বেশ মজার জিনিস। কোন শ্যুটিং করতে হলে অভিনেতা থেকে কলাকুশলী, সবই ইউনিয়ন থেকে নিতে হয়। তার রেট বেশি, তাদের দিয়ে কাজ করানোও বেশ চাপের হয়। সবার উপর ইউনিয়নের হাত থাকে। কেউ কেউ বাজেট বাঁচাতে ইউনিয়নকে না জানিয়ে নিজেদের চেনা পরিচিত লোকেদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। এটা যখন বিপুলদারা জানতে পারেন, তখন সে প্রোজেক্টের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সবাইকে প্রবল ঝাড়ের মুখে পড়তে হয়।
সোহিনী বলল, “আমার সামনের একটা প্রোজেক্টই তো প্রীতমের সঙ্গে আছে। কী করব সেটা?”

বিপুলদা বললেন, “ওকে শো কজ করা হয়েছে। কী উত্তর দেয় দেখি। নইলে আগামী ছ মাস শ্যুটিং করতে দেব না। এটা তো ইয়ার্কির ব্যাপার না, তাই না? সব কাজের একটা সিস্টেম আছে। সিস্টেম ভাঙলে তার শাস্তিও হবে। তুমি ওর কাজ আপাতত পোস্টপন করে দাও। আমি জানালে তবে শুরু করবে”।

সোহিনী ঘাড় নাড়ল, “আচ্ছা”।

বিপুল বেরিয়ে গেলেন।

সোহিনী শ্বাস ছাড়ল। ইন্ডাস্ট্রিতে একটা পাতাও আজকাল বিপুলদা না চাইলে গাছ থেকে পড়ে না।

৮।

সুভাষের কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়ি পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। বাড়ি পৌঁছে সুভাষ দেখল তার শালা মিঠুন বউ বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

তাকে দেখা মাত্র মিঠুন বলল, “এই তো জামাইবাবু এসে গেছেন। কী খবর জামাইবাবু?”

সুভাষ বলল, “এই চলছে, তোমার খবর বল”।

মিঠুন বলল, “শুনলাম আপনি পঞ্চায়েত কমিটির মেম্বার হয়েছেন। তাই দেখা করতে এলাম”।

সুভাষের বউ বলল, “ও এখন কন্ট্রাক্টর হয়েছে জানো তো, রাস্তা ঘাট করছে। আমাদের ওদিকে কয়েকটা পায়খানাও বানিয়েছে”।

মিঠুন বলল, “আমি ভাবলাম নিজের জামাইবাবু থাকতে আমাকে গ্রামে কেন কষ্ট করতে হবে। চলে এলাম। কাজ থাকলে জানাবেন”।

সুভাষ শ্বাস ছেড়ে বলল, “কাজ তো সবাই চায়। আমিও চাই। যোগাযোগ রেখো। দেখব”।

সুভাষের বউ বলল, “হ্যাঁ, তোর জামাইবাবুকে একটু গুছিয়ে নিতে দে। তোর কাজের অভাব হবে না”।

মিঠুন বলল, “আমারই তো ভুল হয়েছিল। আগে ভেবেছিলাম কিছু না কিছু হয়ে যাবে। সে যে গদি উলটে যাবে তা কি বুঝেছিলাম? জামাইবাবু যে দল পাল্টেছেন সেটা দারুণ ডিসিশন নিয়েছেন। লাল পার্টির কাছে আর কিছু নেই এখন। ওদের সব শেষ হয়ে গেছে। এখন অনেক কাজ হচ্ছে। জামাইবাবু দেখলে কিছু না কিছু ঠিক পেয়ে যাব”।

সুভাষ বউয়ের দিকে তাকাল, “খেতে দাও। খিদে পেয়েছে”।

সুভাষের বউ মিঠুনের বউকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোল।

মিঠুন বলল, “তা জামাইবাবু, এখন উপরি কেমন আসছে?”

সুভাষ কড়া চোখে মিঠুনের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমার কি আমাকে ঘুষখোর মনে হয়?”

মিঠুন বলল, “ঘুষ খোরের কী আছে জামাইবাবু? আজকাল ঘুষ ছাড়া কিছু হয় নাকি? এই তো আমাদের পাশের বাড়ির পলাশ, আরে আপনি দেখেন না, লম্বা চওড়া ছেলেটা, কনস্টেবলের পরীক্ষা দিতে গেল। পাঁচ লাখ টাকা চেয়েছে। সে তো আগেও চাইত, এখনো চায়। যারা চেয়েছে তাদের কি লজ্জা আছে? আপনি লজ্জা পাবেন কেন? আর লাল পার্টি বের করে দিল আপনাকে ন হাজারটাকা তহবিল তছরুপের জন্য। এখন যেই শোনে সেই হাসে। ন’হাজার টাকাটা কোন টাকা? এমনি এমনি পার্টিটা গোল্লায় গেছে?”

সুভাষ বলল, “ঠিকাদারি করছো, ক্যাপিটাল পেলে কোথায়?”

মিঠুন বলল, “আপনার কাছে কী আর লুকোই জামাইবাবু, জমি বেচতে হল খানিকটা। তাও তো খাওয়াতে হল। নেতাদের না খাওয়ালে কিচ্ছু বিক্রি করতে দেবে না। দশ খেল বড় নেতা, পাঁচ ছোট। এই তো চলছে। এই জন্যই তো আপনাকে বলছি, খুব ভাল কাজ করেছেন”।

সুভাষ বলল, “ঠিক আছে, আমি দাদাকে বলে রেখেছি। যদি হয়, তাহলে তোমাকে খবর দিও। চিন্তা কোর না”।

মিঠুন বলল, “আমরা পার্টনারশিপে করব জামাইবাবু। একা সব ঘরে নিয়ে যাব তা বলছি না। আপনারও ভাগ থাকবে। এভাবেই তো করছে সবাই। আমাদের পঞ্চায়েতেও হচ্ছে”।

সুভাষ বলল, “কী হচ্ছে?”
মিঠুন বলল, “প্রধানের লোকজনই কাজ করে। সবটাই বেনামে। প্রধানের ঘরে টাকা যাচ্ছে। আপনার তো ভাই বোন নেই। আমি কি পর? বেকার ছেলে, বুঝতেই পারেন”।
সুভাষ মিঠুনের দিকে তাকাল। ইচ্ছা করছিল চড় মারতে। বেকার ছেলে ঠিক আছে, বিয়ে করার সময়, বাচ্চা পয়দা করার সময় তো সেটা মনে ছিল না! এখন তার ঘাড়ে ভর করে পার হতে চাইছে।
সে বলল, “ঠিক আছে, যোগাযোগ রেখো, আমি কিছু হলে খবর দেব। কয়েকটা কাঁচা রাস্তা পাকা হবার কথা আছে। একটা রাস্তা হলেও যদি তুমি পাও, সে চেষ্টা করব। তবে গ্রামের লোক বাইরের লোককে এন্ট্রি দেবে নাকি সেটা কিন্তু জানি না”।
মিঠুন বলল, “তাহলে আমি এখানেই থেকে যাব? অসুবিধা আছে জামাইবাবু?”
মিঠুন আগ্রহী চোখে তাকাল।
সুভাষ বলল, “বাড়ি যাও। যোগাযোগ রেখো। খবর দেব”।
মিঠুন বড় করে ঘাড় নাড়ল, “ঠিক আছে। খেতে চলুন। দিদি পাবদা রেঁধেছে। কতদিন পাবদা খাই না, চলুন চলুন”।
সুভাষ বিরক্ত মুখে খেতে উঠল। মাঝে মাঝে মনে হয় বিয়ে করার থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া ভাল।
৯।
“দেখুন প্রভাসবাবু, আপনাদের পার্টির অবস্থা ভাল না। আর যারা আপনার এই দশা করেছো, সেই পার্টিকে হারাতে গেলে আমাদের হাত ধরতে হবেই। এই সহজ জায়গাটা কি আপনি বুঝতে পারছেন?”
অনন্ত বাজপেয়ী ভাল বাংলা বলেন। প্রভাস অনন্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু এতদিন ধরে একটা দল করে আসছি, সেটাকে ছেড়ে দেওয়া এত সহজ?”
অনন্ত বললেন, “আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। পুজো আচ্চা করেন। এতদিন আমাদের দল এ রাজ্যে সেভাবে সক্রিয় ছিল না, আপনি লাল পার্টি করেছেন, ঠিক আছে। এখন তো আপনাদের জন্য আমরা এসেছি। এই যে একজন পূজারী ব্রাহ্মণকে কন্সপিরেসি করে ঠিক পুজোর আগে ফাঁসিয়ে দেওয়া হল, সেটা কি ভাল কাজ হল?”
প্রভাস চিন্তিত মুখে বললেন, “ফাঁসিয়ে যে দেওয়ার প্ল্যান ছিল সেটা বুঝতেই পারছি। পুজোর আগে ব্যাপারটা মনে হয় কোইন্সিডেন্স ছিল”।
অনন্ত বললেন, “কিচ্ছু কোইন্সিডেন্স ছিল না ব্যানার্জিবাবু, কিচ্ছু কোইন্সিডেন্স ছিল না। আপনাকে পুজো করতে দেবে না সেটাও প্ল্যান করেই করা হয়েছে। ওই মোল্লাদের কাজ সেটা। আপনার কোন পার্টি মেম্বার ছিল না ও দলে গেছে? ওটা তো এখন হিন্দু বিরোধী দল, সেটা বুঝতে পারছেন না? মোল্লারা আপনাকে পুজোটা করতে দেবে না বলেই মুনিষটাকে মেরে আপনাকে ফাঁসিয়ে দিল”।
প্রভাস খানিকটা চমকালেন। ঠিকই তো, সেদিন যারা রতনকে মেরেছিল, তাদের মধ্যে সবাই মুসলমান ছিল। এই ভাবে ভাবেন নি কোন কালেই। চিরকাল একসঙ্গে গ্রামের কাজকর্ম দেখে এসেছেন। পঞ্চায়েত চালিয়েছেন। শুধুমাত্র তিনি হিন্দু বলে আব্দুল এত বড় কাজ করল? আব্দুল তো ছিলও না ঝামেলাটার মধ্যে? নাকি ছিল? তিনিই বুঝতে পারেন নি। তাকে চাপ দিয়ে দল পাল্টানোর জন্য এসব করা হল?
অনন্ত বললেন, “শুনুন প্রভাসবাবু, আপনার লাল পার্টি আর এই এখনকার সবুজ পার্টি, কোন কালে আমাদের মানে হিন্দুদের স্বার্থ দেখে নি। লাল পার্টি রাজ্যটাকে ফিশফ্রাই করে সবুজের মুখের কাছে তুলে দিয়েছে। আপনি আমার কথা শুনুন, আমাদের দলে আসুন। আগে যে বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, সে বিপদটা থেকে তো মুক্ত হতে হবে নাকি? আমরা উকিলের সঙ্গে কথা বলছি। এসব ফলস কেস টেস বেশিদিন টিকবে না। আর আমাদের দল এমনিতেও ওদের শায়েস্তা করবে। দেখছেন না কীভাবে সিবিআই লেলিয়ে দিচ্ছি আমরা? সব ক’টাকে জেলে ঢোকাবো। এসব মনমানি বেশি দিন চলবে না ওদের। আপনি

ব্রাহ্মণ মানুষ, এলাকার পুরনো দিনের নেতা, আপনার কথা চার পাঁচটা গ্রামের লোক শোনে। আপনি আমাদের জয়েন করে যান। নিজেই দেখুন কী করে ওদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াইটা করি। লাল পার্টি না করে প্রতিরোধ, না ওদের সেই লোক আছে। এই এদের হারাতে আপনার আমাদের দরকার হবেই"।
প্রভাস বললেন, "ঠিক আছে, আমি দুদিন ভেবে নি, তারপরে আপনাকে না হয় ফোন করব"?
অনন্ত বললেন, "এতে ভাবার কী আছে ব্যানার্জিবাবু? আপনার দল থেকে আপনাকে উকিল দিয়েছে?"
প্রভাস মাথা নিচু করে মাথা নাড়লেন।
অনন্ত বললেন, "ও আর দেবেও না। আপনাকে কী বললাম? সব সাঁট করে চলছে। মাঝখান থেকে আপনাকে ফলস কেসে ফাঁসিয়ে দিল। আপনাকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি। আপনি আর না করবেন না। কাল স্টেট লেভেলের সেরা অ্যাডভোকেটকে পাঠাচ্ছি আপনার কাছে। আপনি কেস ব্রিফিংটা ওঁকে দিয়ে দিন। বাকিটা আমরা বুঝে নেব। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। আর না শুনব না দাদা"।
প্রভাস বললেন, "তার পরিবর্তে আমাকে কী করতে হবে?"
অনন্ত বললেন, "সেই যে কাজটা আপনি সব থেকে ভাল করে আসছেন, সেটাই করবেন। সংগঠনটাকে ভাল করে সাজান। আমাদের হিন্দুদের অবস্থা তো বেগমের রাজত্বে দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেটা মানুষকে বুঝিয়ে বলুন। ওই সব লাল পার্টির চক্করে পড়ে নিজের জীবনটাকে শেষ করবেন? কম দিয়েছেন পার্টিকে? কী পেলেন? নিজেই ভেবে বলুন"।
প্রভাস কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "বেশ। আমি রাজি। আপনি অ্যাডভোকেটবাবুকে কাল পাঠাবেন তো?"
অনন্ত খুশি হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই। আপনার চিন্তা এখন আমাদের দলের চিন্তা। একদম ভাববেন না"।

১০।

"আরেকবার হিন্দু খতরে মে।
মল্লিকপুর গ্রামে দুর্গাপুজো করতে দিল না মোল্লারা। হিন্দুদের দেবী মূর্তি ভেঙে দিল। সাচ্চা হিন্দু হলে গর্জে উঠুন"।
ক্যান্টিনে লাঞ্চ করছিল অনির্বাণ আর তন্ময়।
হোয়াটস অ্যাপে মেসেজটা দেখে অনির্বাণ বলল, "মল্লিকপুরের কেসটা দেখেছিস?"
তন্ময় বলল, "দুর্গাপুজো করতে দেয় নি শুনেছি। মানে হোয়াটস অ্যাপে পেলাম আর কী। সত্যি মিথ্যা জানি না। তুই আবার গৌতমদাকে কিছু বলতে যাস না। দেখা গেল আমাদের নিউজটা কভার করতে পাঠিয়ে দিল। ওদিকে আমার এখন যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। গ্রামগুলো বারুদের স্তুপের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকগুলো গ্রামে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে"।
অনির্বাণ বলল, "তোষণের জন্য হচ্ছে আর কী! নইলে পুজো টুজো হবে না এ আবার কী"।
"বেশ তো, তোরা গিয়ে দেখে আয় কী ব্যাপার। ফ্রন্ট পেজ নিউজ করে দেব"।
কখন যে গৌতম এসে চুপ করে তাদের কথা শুনছিলেন অনির্বাণ আর তন্ময় বুঝতে পারে নি। তন্ময় ব্যাজার মুখে অনির্বাণের দিকে তাকাল।
অনির্বাণ বলল, "প্লিজ গৌতমদা, এইসব গ্রামে পাঠিও না, এখনো বিয়ে হল না আমার। এখনই মরতে চাই না মাইরি"।
গৌতম বললেন, "থাম। কিসসু হবে না। সকালে যাবি, দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবি"।
অনির্বাণ বলল, "কেন, ওই দিকে আমাদের লোকাল রিপোর্টাররা নিউজটা করলে হচ্ছে না তোমার?"
গৌতম চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, "না হচ্ছে না। ওদিকটায় কাউকেউ আজকাল ভরসা হচ্ছে না। তোরা এখান থেকে গেলে যেটা হবে, আমি একটা আন বায়াসড অ্যাঙ্গেল পাবো। কী মারাত্মক ব্যাপার বল দেখি, দেশ ভাগটাই হল যেটার ওপর দাঁড়িয়ে, এখন আবার সেই ঝামেলাগুলো ফিরে আসছে? বাপরে!

আর বাই দ্য ওয়ে, খবরটা যদি ফেক হয়, তাহলে এই মেসেজটা যে পাঠিয়েছে, তার এগেইন্সটে সাইবার সেলে কমপ্লেইন করব ঠিক করেছি”।
তন্ময় বলল, “আহা, ওভাবে হয় নাকি? দেখা গেল একজন হয়ত নিউজটা দেখে উত্তেজিত হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে”।
গৌতম বললেন, “তাতেও আইটি অ্যাক্টে ছাড় পাবে না। তুই একটা নিউজ পেলি। সত্যি মিথ্যে যাচাই না করে সেই নিউজটা সারকুলেট করে দিলি? তোরা দুজনেই তো যথেষ্ট দামড়া হয়েছিস, তোদের যে সব বন্ধু পাঠাচ্ছে, তারাও তো শিক্ষিতই নাকি রে?”
তন্ময় বলল, “হ্যাঁ, আমাকে যে পাঠিয়েছে সে সেক্টর ফাইভে ভাল চাকরি করে”।
গৌতম কাঁধ ঝাঁকালেন, “তবে? শিক্ষিত মানুষেরা এই যে মেসেজগুলো পাঠাচ্ছেন আধা খ্যাচড়া হিন্দি মেশানো বাংলায়, সেটা সত্যি না মিথ্যা তা যাচাই করতে হবে না? আমাদের সেটাই দেখতে হবে। এই মুহূর্তে ফেক নিউজ আর ফেক প্রোপাগান্ডা কিন্তু মারাত্মক ভাবে এই স্টেটে ছড়িয়ে পড়ছে। ফেক নিউজ বাস্টার বলে কিছু একটা কলাম চালু করাই যায়”।
তন্ময় বলল, “তারপর সরকার পাল্টালে আমাদের পিছনে হুড়কো হবে”।
গৌতম হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, “ছাড় তো, বেগতিক দেখলে সময় বুঝে পালটি খেয়ে নেওয়া যাবে। সব ভুলে যাস নাকি? পরিবর্তনের সময় যে রিপোর্টার হেলিকপ্টারে করে ঘুরে বেরলো, পরের বছর ভোটের সময় সে রিপোর্টারই তার অ্যান্টি হয়ে গেল। রেজাল্ট বেরনোর পরে আবার যে কে সেই। আজকাল সবই ভোলাটাইল হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ...”
গৌতম একটু থেমে বললেন, “এই হোয়াটস অ্যাপ ফরোয়ার্ডগুলো নিয়ে সব তরফেই নড়ে চড়ে বসা দরকার আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। সত্যি মিথ্যে যাচাই করাটা অ্যাটলিস্ট হোক। তোরা নিজেদের নিয়েই ভাব। এখনও মল্লিকপুর কীভাবে যেতে হয়, তোরা ভাল করে জানিস না, অথচ মল্লিকপুরে কী হয়েছে সেটা তোরা না জেনে ফরোয়ার্ড করে দিচ্ছিস”।
অনির্বাণ বলল, “না না আমি ফরোয়ার্ড করি নি”।
গৌতম বললেন, “ওই হল। আজ করিস নি, কাল এলে কাল করবি। এটাই তো গোয়েবেলসের থিওরি। একটা মিথ্যা বার বার বলে যেতে যেতে সেটাকে সত্যি করে দেওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। তোরা দুজন কাল মল্লিকপুর ঘুরে আয়। রাতের মধ্যে আমার রিপোর্ট চাই। ব্যস”।
অনির্বাণ আর তন্ময় মুখ কালো করে পরস্পরের দিকে তাকাল।
১১।
দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের এক বাড়ির বসার ঘরে অনিন্দ্য অপেক্ষা করছিল।
তপন ড্রয়িংরুমে ঢুকে অনিন্দ্যকে দেখে বললেন, “ওহ তুমি এসে গেছো, সরি সরি, বাজারে একটু সময় লেগে গেল। এত দাম জিনিসপত্রের”।
অনিন্দ্য উঠে এসে তপনকে প্রণাম করল।
তপন হাঁ হাঁ করে উঠলেন, “আরে আরে এসবের কোন দরকার নেই। তুমি বস। আমি এক মিনিট ভিতর থেকে আসছি”।
অনিন্দ্য বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল।
তপন একমিনিটই নিলেন। ঘরে ঢুকে সোফায় বসে বললেন, “পরের বাড়িতে থাকলে নিজের বাড়ির ফিলটা পাওয়া যায় না। তবে ছেলের কাছে থাকি বলে নিজের বাড়িতেই আছি বলে মনে হয়। অমিতাভ কেমন আছে?”
অনিন্দ্য বলল, “বাবা ভাল আছে। আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলল”।
তপন বললেন, “তোমাদের তো সামনেই স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ভোট, তাই না?”

অনিন্দ্য বলল, "হ্যাঁ"।
তপন বললেন, "অমিতাভ বলছিল তুমি আমার থেকে নাকি কী সব ইনপুটস নিতে চাও। তোমরা এত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, এখানে তো সবাই চান্স পায় না, আমি তোমাকে কী সাহায্য করব?"
অনিন্দ্য একটু ইতস্তত করে বলল, "অ্যাকচুয়ালি ইউনিভারসিটিতে অনেকেই আমাকে এই চৌত্রিশ বছর নিয়ে অনেক প্রশ্ন করে। এত বছর লেফটিস্টরা রুল করার পরেও সেখানে কমিউনাল ফোর্স ডে বাই ডে শক্তিশালী হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে আগে এত কমিউনাল টেনশনও ছিল না। অভিযোগ উঠছে বামেরাই নাকি রাম হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ক্লিয়ার হতে চেয়ে বাবাকে ফোন করলাম। বাবা বলল আপনি যখন দিল্লিতেই আছেন তখন আপনাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে অনেক ভাল উত্তর পাওয়া যাবে"।
তপন হেসে ফেললেন, "আমি তো এই প্রশ্নগুলো শুনলে এড়িয়ে যাই। তুমিও তাই কোর। কী আর বলবে?"
অনিন্দ্য বলল, "কমিউনিস্ট পার্টিকে যারা এককালে সাপোর্ট করত তারা কী করে কমিউনাল পার্টিকে সাপোর্ট করে?"
তপন বললেন, "খানিকটা বিকল্পের সন্ধানে। আর খানিকটা হোয়াটস অ্যাপ ইউনিভার্সিটির কৃপায়। চন্দ্রবিন্দু শোন? আমি কিন্তু শুনি"।
অনিন্দ্য মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, শুনি তো"।
তপন বললেন, "চন্দ্রবিন্দুর একটা লাইন আছে 'আমরা পাঞ্জাবীদের পাইয়া বলি, মারোয়াড়ি মাউরা আর নন কমিউনাল দেওয়াল লিখি ক্যালকাটা টু হাওড়া'। অ্যাকচুয়ালি দোষটা কার বলে তোমার মনে হয়?"
অনিন্দ্য বলল, "সুবিধাবাদের?"
তপন বললেন, "সত্তর শতাংশ। বাকি তিরিশ শতাংশ মেরুদণ্ডহীনতার। ডিক্টেটরদের নিয়ে সিনেমা দেখেছো কোন?"
অনিন্দ্য বলল, "আলাদীন দেখেছি"।
তপন বললেন, "গুড। আমিও দেখেছি। তাতে কী দেখা যাচ্ছে? একজন ডিক্টেটর যা ইচ্ছা তাই করে যাচ্ছে, কেউ কিছু বলার নেই। বলবে কী করে? সবাই ভয়েই মরে যাচ্ছে। 'রাজা তোর কাপড় কোথায়' বলার মেরুদন্ডটির বড় অভাব। যাক গে, অন্যকে দোষ দেওয়ার আগে নিজেদের দিকে তাকানোটা জরুরি। তুমি বলছিলে না আমাদের মধ্যে কেন এত রামে যোগদানের প্রবণতা আসছে? এর কারণ আর কিছুই না, আমাদের বামপন্থীদের ভিতরেও এই সাম্প্রদায়িকতার বীজ খুব সযত্নে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখা ছিল। বহু বামপন্থী এখনো বলে দেখবে আমরা বাঙালি, ওরা মুসলমান। হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্বের বীজ সেই দেশভাগেরও আগে থেকে আমাদের ভিতরে বপন করা আছে। তার ওপরে আমরা বর্ডারের কাছে থাকি। খড় শুকনো হয়েই আছে। এখন শুধু উপযুক্ত পরিবেশে সেই খড়ে একটু একটু করে অগ্নিসংযোগ চলছে। লড়াইটা খুব কঠিন অনিন্দ্য। বামপন্থীরা যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে, এই সাম্প্রদায়িকতা তত পাল্লা দিয়ে বাড়বে। মানুষ বুঝছে না, সামনে আরো কঠিন দিন অপেক্ষা করে আছে"।
অনিন্দ্য বিমর্ষ গলায় বলল, "ওরা আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও প্রচুর চাপ দিচ্ছে। ক্রমাগত আমাদের দেশদ্রোহী প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। পেটোয়া চ্যানেলে যা করার তো করছেই, আমাদের মিটিং মিছিলগুলোর ভিডিও মর্ফ করে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেখিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা প্রতিরোধ করছে বটে কিন্তু ভয়ও পাচ্ছে। আমরা ওদের কী এমন ক্ষতি করেছি বলুন তো? আমাদের নামে মিথ্যে কেস দিয়ে দিচ্ছে, এমনকী গ্র্যান্ট পর্যন্ত কমিয়ে দিচ্ছে!"
তপন বললেন, "কারণ 'ওরা যত বেশি জানে, তত কম মানে'। মানুষ যদি বেশি শিক্ষিত হয়ে পড়ে, তাহলে কি আর হোয়াটস অ্যাপ ইউনিভার্সিটির বানিয়ে দেওয়া সাজেশন মেনে চলবে? তখন তারা সেই তথ্য যাচাই করতে যাবে। গতে বাঁধা জীবনকে দূরে সরিয়ে রেখে যে ছাত্র ছাত্রীরা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নেবে, তাদের থেকেই ওদের ঝুঁকি সব থেকে বেশি। একদিকে যা হচ্ছে, ভাল হচ্ছে, এটা আমি বলব। মানুষের সব থেকে

খারাপটা দেখা ভীষণ জরুরি। নইলে মানুষের সংবিত ফেরে না। সত্তর সালে কংগ্রেসীরা চূড়ান্ত দমন পীড়ন না করলে আমরা সাতাত্তরে ক্ষমতায় আসতাম না। মানুষ নিঃশব্দ বিপ্লব করে আমাদের ভোটে জিতিয়েছে"।
অনিন্দ্য বলল, "আর এখন সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই আপনারা জোট করছেন?"
তপন বললেন, "ব্যক্তিগতভাবে হয়ত আমি জোটের বিরোধী, তবু এই ক্ষেত্রেও একটা ট্যারাব্যাকা যুক্তি দেওয়াই যায়"।
অনিন্দ্য বলল, "কী রকম?"
তপন বললেন, "টু ফাইট এগেইন্সট কমিউনাল ফোরস, ইউ হ্যাভ টু গেট ইউনাইটেড"।
অনিন্দ্য বলল, "ভোটের আগে রাহুল গান্ধী মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম করে বেড়াচ্ছে যে? কড়া হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে তো সেই নরম হিন্দুত্বকেই প্রজেক্ট করতে হচ্ছে। তাহলে কী লাভ হচ্ছে?"
তপন হাসলেন, "এই জন্যই তো কমিউনিস্টদের দরকার। ঠিক এই বেসিক জায়গাতেই। এমন একটা দল দরকার যারা জাতের কথা না বলে ভাতের কথা বলবে, মানুষে বিভেদ না তৈরী করে শ্রমিক কৃষকের কথা বলবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মধ্যেও সেই বিচ্যুতি এসেছে। এখন আমাদের ভরসা তোমাদের মত যুবরাই। আর এই জন্যই ওরা সেই তোমাদেরই ভয় পাচ্ছে। ওরা জানে, একমাত্র তোমরাই পারবে সমস্ত ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিতে। আমাদের দেশে বাবা রাম রহিম ঈশ্বর হয় আর কবি ভারভারা রাও দেশদ্রোহী। এই দেশ পাল্টাতে হবে না? তোমার কী মনে হয়?"
অনিন্দ্যর মুখ উজ্জ্বল হল। বলল, "বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলাম কাকু। আমি যদি মাঝে মাঝে আসি, আপনি কি বিরক্ত হবেন?"
তপন বললেন, "একেবারেই নয়। দাঁড়াও, ভাল মিষ্টি এনেছি, খেয়ে যাও"।
১২।
স্টেশন থেকে নেমে মল্লিকপুর গ্রামের দিকে যেতে অটো নিতে হয়। অটো স্টার্ট নিলে অনির্বাণ বলল, "সুন্দর জায়গা। এসব জায়গায় ওসব হাঙ্গামা হয়, কে বলবে?"
তন্ময় বলল, "সেই। যত বাজে ঝামেলা। গৌতমদারও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। ওরে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এর এত ইচ্ছা থাকলে নিজে আয়"।
অনির্বাণ বলল, "বস ভাই, বস উনি। নিজে কেন আসতে যাবেন? আমাদের মত গরীব পাবলিক মার খাবে, আর সেসব দেখিয়ে ফুটেজ খাবে নিউজপেপার। বুঝলি না?"
তন্ময় বলল, "বুঝব না আবার? যতসব!"
প্রভাস বাড়িতেই ছিলেন। গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে মিটিং করছিলেন। অনির্বাণরা পরিচয় দিতে বললেন, "আপনারা এত দূর থেকে এসেছেন। হাত মুখ ধুয়ে বসুন। আমি আসছি"।
অমলা তাদের টিউবওয়েল দেখিয়ে দিলেন। প্রভাসের বাড়ির পিছন দিকটায় বসতে দেওয়া হল তাদের। শীতের নরম রোদে খাটিয়ায় বসতে বেশ ভাল লাগছিল। অনির্বাণ বলল, "সব ঢপ শালা। এখানে যদি পুজো বন্ধই হবে, তাহলে এত নিরুপদ্রব হত না চারদিক"।
তন্ময় বলল, "সে তো বটেই। তবে চুপ থাকবি। ভদ্রলোকের পেট থেকে বের করতে হবে কেসটা কী"।
মিনিট দশেক পরে প্রভাস একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসে বললেন, "বলুন"।
অনির্বাণ বলল, "দেখুন প্রভাসবাবু, আমরা আসলে একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ড করতে এসেছি। এই মুহূর্তে গোটা দেশে মল্লিকপুরের একটা খবর সারকুলেট হয়ে চলেছে। এখানে নাকি মুসলমানেরা দুর্গাপুজো হতে দেয় নি। মূর্তি ভেঙে দিয়েছে ইত্যাদি। এটা কি সত্যি খবর?"
প্রভাস বললেন, "এখানে আসার আগে কাউকে জিজ্ঞেস করেন নি ঘটনাটা সত্যি কি না?"
অনির্বাণ বলল, "সাহস পাই নি ঠিক। মনে হল আপনাকে জিজ্ঞেস করাই ভাল"।
প্রভাস বললেন, "ব্যাপারটা আরেকটু গভীরে"।

তন্ময় বলল, “কী রকম? যদি একটু খোলসা করে বলেন, তাহলে উপকৃত হই”।
প্রভাস বললেন, “আমার বাড়িতে প্রতি বছরই দুর্গাপুজো হয়। এবছরও হবার কথা ছিল। ঠিক তার আগে আমাকে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে দিল ওরা। আমার বাড়িতে যে ছেলেটি মুনিষ খাটত, তাকে আমার সামনেই পিটিয়ে খুন করা হল। খুন করল মুসলমানেরা। লক্ষ্য ছিল যাতে এ বাড়িতে পুজো না হয়”।
অনির্বাণ বলল, “এটাই আপনার অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট”?
প্রভাস বললেন, “শুধু অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট না, এটাই আসল ঘটনা”।
তন্ময় বলল, “হিন্দু মুসলমান অ্যাঙ্গেলটা কি আদৌ ছিল? না সেটা পরে আপনার মনে হল?”
প্রভাস তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমার প্রথমে মাথায় আসে নি। পরে ভেবে দেখেছি। ওরা বরাবরই এরকম। উপরে উপরে অসাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পরে থাকে। কিন্তু ওরা এভাবেই একটু একটু করে আমাদের কোণঠাসা করে ফেলছে। এর ফলে এই রাজ্যে আমরা, মানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছি, আর ওরা এ রাজ্যটাকে পাকিস্তান করে দিচ্ছে”।
অনির্বাণ বলল, “প্রভাসবাবু, আপনি কি দল পাল্টাচ্ছেন?”
প্রভাস বললেন, “হ্যাঁ। সামনেই কলকাতার রাজ্য অফিসে গিয়ে আমি অন্য দল জয়েন করছি। আমার মনে হয়েছে, এই দলটিই এখন হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করবে”।
অনির্বাণ বলল, “আপনি হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে?”
প্রভাস বললেন, “কেন নয়? দেশভাগে যদি মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ হবে, তাহলে হিন্দুদের জন্য কেন আলাদা দেশ হবে না? কেন মুসলমানেরা জোর করে আমাদের পুজো নষ্ট করে দেওয়ার সাহস দেখাবে এখনো। এসব কিছুতেই আর মেনে নেওয়া যাবে না। আমি সক্রিয়ভাবে এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাব ঠিক করেছি”।
অনির্বাণ আর তন্ময় মুখ চাওয়া চাওই করল।
প্রভাস বললেন, “আশা করি আপনাদের আর কিছু জানার নেই। দুপুরে খেয়ে যাবেন। নইলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে”।
অনির্বাণ বলল, “আপনি যে দলে জয়েন করছেন, সে দলের সংগঠন তৈরীর কাজ কি শুরু করে দিয়েছেন?”
প্রভাস বললেন, “হ্যাঁ। সেটাই স্বাভাবিক না? আমার যারা অনুগামী আছে, তাদের বোঝাতে হচ্ছে”।
অনির্বাণ বলল, “তাদের মধ্যে মুসলমান নেই?”
প্রভাস কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, “আছে, তবে তারা বুঝতে পারছে তোষণের রাজনীতিতে তাদের আখেরে কোন লাভ হচ্ছে না। তাছাড়া স্থানীয় পঞ্চায়েতের সীমাহীন দুর্নীতিতে সবাই তিতিবিরক্তও বটে। আপনারা বসুন, আমি ওদিকটা দেখে আসি”।
প্রভাস উঠে ঘরের ভিতরে রওনা দিলেন।
অনির্বাণ তন্ময়ের দিকে তাকাল, “কী বুঝলি?”
তন্ময় বলল, “হাফ ট্রুথকে মশলা মাখিয়ে গোল্ডেন ট্রুথ বানিয়ে হোয়াটস অ্যাপে ঘোরানো হচ্ছে আর কী! আপাতত চেপে যা। ভদ্রলোক কেস খেয়ে আছেন অলরেডি। আর খেপিয়ে লাভ নেই”।
১৩।
“দুটো টাওয়ার উঠবে দাদা। বারোটা করে ফ্লোর থাকবে পার টাওয়ার। সয়েল টেস্ট ফেস্ট করে নেব। এই মুহূর্তে আমাদের লেটেস্ট প্রোজেক্ট এটাই”।
পরাগ শর্মা শহরে নতুন প্রোমোটার। প্রত্যুষের কাছে সময় চেয়েছিল।
রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে প্রত্যুষ দেখলেন পরাগ বসে আছেন। অগত্যা পরাগের সঙ্গে বসতে হল।
প্রত্যুষ বললেন, “কিন্তু এই সাইটে আপনি পুকুর বোজাবেন, তাই তো?”

পরাগ বলল, “সে নিয়ে দাদা কোন চিন্তা করবেন না। লোকাল ক্লাবের বিল্ডিং করে দিচ্ছে। এলাকা থেকে চারটে ছেলে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি দিয়ে দেব। সেসব সেট হয়ে গেছে”।

প্রত্যুষ বললেন, “ওহ। সব ঠিক করেই নিয়েছেন? তো আমাকে লাগবে কেন?”

পরাগ দাঁত বের করল, “দাদা, আপনিই তো সব। আপনার এরিয়ায় হচ্ছে, আপনি পারমিশন না দিলে কাজ বন্ধ করে দেব আমার কোন তাড়া নেই”।

সারাদিন প্রচুর মিটিং করতে হয়েছে। প্রত্যুষের ক্লান্ত লাগছিল।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, “ক্লাবে কত খাইয়েছেন?”

পরাগ বলল, “তিন দাদা। কাউন্সিলর চার। আর আপনার জন্য দশ নিয়ে এসেছি। ক্যাশ। গুণে নেবেন?”

প্রত্যুষ এসব ক্ষেত্রে দেরী করেন না। এবারে হঠাৎ করেই দেওয়ালের একটা ছবিতে তার চোখ গেল। তপনের সঙ্গে ত্রিবান্দ্রম গেছিলেন একবার। বছর বিশেক আগে। সেই ছবিটা কোন এক অজানা কারণে এখনো বাড়ির দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। তপন যেন তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

পরাগের দিকে তাকিয়ে প্রত্যুষ বললেন, “কুড়ি লাগবে। আর আমি গড়িয়াহাটের দোকানী নই যে বারগেইন করব”।

পরাগ জিভ কেটে বলল, “না না দাদা। ছি ছি। আমি তো জানতাম না। কাল সকালেই আমি বাকিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাহলে আপনার আশীর্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করব?”

প্রত্যুষ মাথা নাড়লেন, “করুন”।

পরাগ উঠল, “আমি উঠি তবে?”

প্রত্যুষ বললেন, “যান”।

পরাগ যেতে সোফার ওপর রেখে যাওয়া ব্যাগটা খুললেন প্রত্যুষ। আরো কালো টাকা। এক কালে কোন দিন ভাবেন নি এভাবে হাত পেতে টাকা নেবেন। আজকাল কেমন জলভাত হয়ে যাচ্ছে। দু হাজার টাকার নতুন নোটের পাঁচটা বান্ডিল। আগে টাকা দেওয়া অসুবিধে ছিল। আজকাল দু হাজার টাকার নোট হওয়ায় লেনদেন আরও সহজ হয়ে গেছে।

দেবযানীকে ডাকলেন প্রত্যুষ। টাকাটা দিয়ে বললেন, “আলমারিতে তুলে রেখো। একটা বান্ডিল সরিয়ে রেখো। ওটা সুবোধ নিয়ে যাবে। বাকি কিছু কেনার থাকলে কিনে নিও, নইলে রেখে দিও দেখব কী করা যায়”।

দেবযানী টাকাটা নিয়ে বললেন, “খেয়ে এসেছো নাকি?”

প্রত্যুষ বললেন, “না। খাব। আর শোন”।

দেবযানী বললেন, “কী?”

প্রত্যুষ বললেন, “তোমাকে বলেছিলাম না আমার আর তপনের ছবিটা সরিয়ে দিতে?”

দেবযানী বললেন, “হ্যাঁ বলেছিলে”।

প্রত্যুষ বললেন, “তাহলে সরাও নি কেন?”

দেবযানী বললেন, “নানা কাজে ভুলে গেছিলাম। সরিয়ে দেব?”

প্রত্যুষ বললেন, “হ্যাঁ। এখনই সরাও। কত জন আসে। ওর সঙ্গে আমার ছবিটা এখন দেওয়ার দরকার নেই, বুঝলে না?”

দেবযানী ঘাড় নাড়লেন। বললেন, “ঠিক আছে, টাকাটা রেখে এসে সরিয়ে দিচ্ছি ফটোটা”।

প্রত্যুষ উঠে বললেন, “দরকার নেই, আমিই সরাচ্ছি”।

দেওয়াল থেকে ফ্রেমটা খুললেন প্রত্যুষ। দুজনেই হাসছেন। যেন একটা দীপ্তি বেরোচ্ছে দুজনের মুখ থেকে। নতুন উদ্যমের দীপ্তি, তারুণ্য আর সততার দীপ্তি।

কয়েক সেকেন্ড ছবিটার দিকে তাকিয়ে ফ্রেম থেকে সেটা বের করে ছিঁড়ে ফেললেন প্রত্যুষ। দেবযানী ঘরে এসে অবাক হয়ে বললেন, "এভাবে ছিঁড়ে ফেললে কেন? আমাকে দিতে, আমি ব্যবস্থা করে দিতাম"।
প্রত্যুষ বললেন, "নাহ। ঠিক আছে। ছেলে কোথায়? বাড়ি আসে আজকাল ঠিক ঠাক? খোঁজই নেওয়া হচ্ছে না। ওর ব্যবসা কেমন চলছে?"
দেবযানী বললেন, "ছেলে অনেক আগে ঘরে এসে ঘুমোচ্ছে। ব্যবসা খারাপ চললে তোমার কানে ঠিক পৌঁছে যেত, তাই না? যাক গে, চল, খেয়ে নেবে"।
প্রত্যুষ ছবির টুকরোগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন।
তারপর দেবযানীকে বললেন, "আরেকটা ইনস্টলমেন্ট কাল দিয়ে যাবে। আমি না থাকলে তুমি নিও। আর টাকা না দিয়ে গেলে জানিও। প্রোজেক্ট বন্ধ করে দেব বিহারীটার"।
হঠাৎ করে প্রত্যুষের উত্তেজিত হয়ে যাওয়ার কারণটা দেবযানী বুঝলেন না। শুধু বললেন, "ঠিক আছে। আমি তোমাকে জানাব"।
১৪।
"সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে সব সময় সংগঠনই যে লাগে, সেটা না। ২০১১তে যে দল ক্ষমতায় এল, বা সাতাত্তরে যারা এসেছিল, ভোটের আগে তাদের বিরাট কোন সংগঠন ছিল, ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম নয়। একেকটা দল একেক রকমভাবে ক্ষমতায় আসে। এ রাজ্যে যে দলটা হোয়াটস অ্যাপে এরকম ফেক মেসেজ ছাড়ছে, তারা তিন ভাবে এগোচ্ছে।
এক, যে ঘটনাই ঘটুক, সেটাকে রঙ মাখিয়ে ধর্ম বিপন্ন বুঝিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।
দুই, ফেক নিউজ সারকুলেশন।
তিন, হিন্দু ধর্মকে মধ্যযুগীয় ধর্ম বানিয়ে দেওয়া। মানে যে ধর্মটা এতদিন ধরে ক্রমবিবর্তিত হয়ে সব থেকে উদার ধর্ম হিসেবে এক্সিস্ট করছিল, সে ধর্মটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা। আজ থেকে দশ বছর আগেও হিন্দু ধর্ম জিনিসটা এত সেনসিটিভ ছিল না। এখন এরা সেটাকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে। খেলার ফলাফল মারাত্মক হতে চলেছে। ধীরে ধীরে গোটা রাজ্যটাই বারুদের স্তূপের ওপর গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাব্যগ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থ বানিয়ে ফেলছে এরা, অদ্ভুত সব যুক্তি সাজানো শুরু করছে, এই ব্যাপারগুলোর যদি ঠিক ঠাক কাউন্টার না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার"।
গৌতম কথাগুলো বলে থামলেন।
মল্লিকপুর থেকে ফিরে পরদিন সকাল বেলা অনির্বাণ আর তন্ময় গৌতমের কাছে রিপোর্ট করতে এসেছে। সবটা শুনে গৌতম মৃদু হেসে বলেছেন, "জানা কথা। ব্যাপারটায় যে রঙ চড়ানো হয়েছে, সেটা আগেই বুঝেছিলাম"।
তন্ময় গৌতমের লম্বা বক্তব্যের উত্তরে বলল, "ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলতে? আমরা কীভাবে কাউন্টার করব? কেনই বা করব?"
গৌতম বললেন, "বামিয়ানে তালিবানরা বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দিয়েছিল। আর এরা পারলে তাজমহল ভেঙে দেয়। হয় ভাঙবে, নয় কাল প্রমাণ করে দেবে তাজমহল আসলে একটা মন্দির ছিল। এগুলো সবই তো প্রোপাগান্ডা। এই প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য এদের ইন্টেলেকচুয়াল সেলও আছে। তাদের কাজ হল সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন কুযুক্তি দিয়ে এসব নিয়ে গরুর রচনা লেখা। ইতিহাসটাকেই পাল্টে দেওয়া। ভারতবর্ষ কাদের দেশ? যারা আগে এসেছিল তাদের? সেদিক দিয়ে ভাবলে পৃথিবীর কোন দেশই কারো না। মধ্যযুগের আগে এই দেশে শুধু হিন্দুরা ছিল বলে দেশটা হিন্দুদের? সে যুক্তি দিতে এলে তো বলতে হবে এ দেশে বৌদ্ধদেরও সমান অধিকার আছে। একটার পর একটা জাত এসে এই ভূখন্ডে আশ্রয় নিয়েছিল। যত সময় গেছে, এখানে তাদের অধিকার জন্মেছে। আজকে দেশভাগের সময় তো পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের ভারতে চলে আসতে হয়েছিল। এখানে অনেকেই দখল করে থেকেছে। তাহলে কালকে তাদেরও তাড়িয়ে দিবি?"

তন্ময় বলল, "কিছুই বলা যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে তাদেরও তাড়ানো হতে পারে। এই যে অনির্বাণ বাঙাল, কাল দেখা গেল বেচারাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিল"।

অনির্বাণ বলল, "ধুস, আমার এসব আলোচনা পোষাচ্ছে না, আমাকে বল তো কী করতে হবে। এই রাজ্যে বসে যে ধর্ম নিয়ে কোন দিন আলোচনা করতে হবে সেটা ভাবিই নি কোন দিন"।

গৌতম কাঁধ ঝাঁকালেন, "একজ্যাক্টলি। ধর্ম এমন এক বস্তু যেটা সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। এটা নিয়ে বেশি মাতামাতি করা বা বেশি বিতর্ক হলে তোকে বুঝতে হবে গুরুত্বপূর্ণ কোন জায়গা থেকে তোর চোখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই ব্যাপারটা করা হচ্ছে। দ্যাট ইনক্লুডস বেসরকারিকরণ অফ অল গভরনমেন্ট সেক্টরস অর প্রাইজ হাইকস অফ এসেনসিয়াল থিংকস। যাই হোক, লেটস মুভ অন। এই মুহূর্তে তোদের কাজ হল একটা রিপোর্ট বানানো। আমরা মল্লিকপুরের ব্যাপারটা নিয়ে ফ্রন্ট পেজ নিউজ করব। পুরো ব্যাপারটা কতটা ফেক, সেটা লেখ। লেটস কাউন্টার দেম। দেখা যাক, কতদূর সাফল্য পাই"।

তন্ময় বলল, "যাই বল গৌতমদা, অনির্বাণ বাংলাদেশে চলে গেলে ইস্টবেঙ্গলের কী হবে? একটা ডাই হার্ড ফ্যান হারাবে ইস্টবেঙ্গল"।

গৌতম একটু হেসে গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোরা কী ভাবছিস শুধু বাঙালদেরই ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর প্ল্যান হচ্ছে? তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছিস। দে হ্যাভ বিগার প্ল্যানস। প্রথমে হিন্দু মুসলমান। মুসলমান না থাকলে তারপর হিন্দুদের মধ্যে কাস্ট নিয়ে লাগাবে। ফ্যাসিস্টরা ডিভাইড অ্যান্ড রুলের ধর্মে বিশ্বাসী। দুদিন পরেই ব্রাহ্মণ শূদ্রে ঝামেলা লাগাবে। দুটো অপশন আছে। যা হচ্ছে দেখে যাওয়া। নয়ত কাউন্টার করা। আমি সেকেন্ডটা বাছব। শেষ নিঃশ্বাস অবধি আমি এদের বিরুদ্ধে লড়ে যাব, অ্যাট এনি কস্ট। চল রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি বানিয়ে পাঠা। লেটস স্টার্ট দ্য ওয়ার"।

তন্ময় আর অনির্বাণ উঠল।

১৫।

সন্ধ্যে সাতটা।

শ্যামলী অঞ্জনার সঙ্গে বসে টিভি দেখছিলেন।

শুভায়ুর অফিস থেকে আসার সময় হয়েছে। তপন ইভনিং ওয়াকে বেরিয়েছেন।

শ্যামলী বললেন, "রাজ্যের বাইরে থাকার এই এক অসুবিধে। পুজোর সময়টা মিস করি খুব"।

অঞ্জনা বলল, "বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে?"

শ্যামলী মাথা নাড়লেন, "আমার আর ইচ্ছা করে না। একবারেই করে না। চোখের সামনে চেনা জায়গা, চেনা মানুষগুলো পাল্টাতে দেখেছি তো, সেই ইচ্ছাটাই চলে গেছে। ওরও চলে গেছে"।

অঞ্জনা বলল, "বাড়ি ভুলে যাওয়া কি এত সোজা মা?"

শ্যামলী বললেন, "ভুলতে হচ্ছে। আমাদের আগের প্রজন্মও এভাবেই ভুলেছিল হয়ত। যাদের সঙ্গে বড় হয়েছো, যেসব মানুষের জন্য দিন রাত এক করে কাজ করেছো, তারা যখন তোমার গায়ে কালি লাগাবে, তখন ভাল লাগবে? শুভায়ুর বাবার কথা ভাবো, যে লোকটা আজীবন কারো থেকে এক টাকারও সাহায্য নিলেন না, সরকার পাল্টানোর পর তাকে কতরকম আক্রমণের মুখোমুখি হতে হল। শেষ পর্যন্ত উনি তো একপ্রকার ঘেন্নাতেই শহর ছেড়ে এলেন। মানুষ শুধু নিজেরটাই বুঝে গেল। তাও ভাল, সোনালী ছিল, নয়ত তোমাকেও সারাজীবন সে নরকেই কাটাতে হত"।

অঞ্জনা বলল, "তা ঠিক। যে লোকটাকে রাজনীতির বলি হতে হল, সে লোকটা যদি মানুষের পাশে দাঁড়াত আজ, তাহলে মানুষেরই উপকার হত। কী করবে আর, লোকে যদি নিজের ভালটাই না বোঝে"।

শ্যামলী বললেন, "উনি একটা কথা বলেন, এ দেশে যতদিন দশ কুড়ি টাকার বিনিময়ে আর ধর্মের বুলি আউড়ে ভোট হবে, ততদিন দেশটা আরো পিছিয়ে যাবে"।

অঞ্জনা বলল, "মানুষই বা কী করবে? বেকারত্বের যা হাল হয়েছে। চাকরি বাকরিই বা কোথায়? কতগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে..."

অঞ্জনার কথা শেষ হল না, কলিং বেল বাজল। অঞ্জনা উঠে দরজা খুলল।

শুভায়ু ঘরে ঢুকে ব্যাগ রেখে সোফায় বসে পড়ে বলল, "বাপরে, কী চাপ গেল আজকে! বাবা ফেরে নি এখনো? ওহ বাবার তো এখনো আধঘন্টা লাগবে মনে হয়। নিউজ চ্যানেলটা দাও তো, ইউনিভার্সিটিতে নাকি আবার ঝামেলা হয়েছে! দেখি"।

অঞ্জনা নিউজ চ্যানেল দিল। টিভিতে দেখাচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পুলিশ ঢুকেছে। একজন নেতা বলছে ইউনিভার্সিটিতে নাকি ষোলশো কন্ডোম পাওয়া গেছে। ছাত্ররা পড়াশুনা করে না। নেশা করে। অ্যাংকরও সমান তালে সে নেতার সঙ্গে লাফালাফি করছে।

শুভায়ু বিরক্ত গলায় বলল, "এরা নিউজ চ্যানেল চালায় না কুস্তি লড়ে কে জানে। কলেজ ইলেকশনও করতে দেবে না ঠিক করে দেখছো? কী যে রাগ এদের ছাত্রদের উপর কে জানে"!

শ্যামলী বলল, "আমি মুড়ি মেখে আনি তোরা বস"।

শ্যামলী রান্না ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তপন ফিরলে বাড়ির সবাই মিলে টিভির সামনে আড্ডা বসবে।

অঞ্জনা মুচকি হেসে বলল, "নেতাবাবুরা আজকাল কন্ডোম গুণছে দেখছো?"

শুভায়ু বলল, "নেতাদের কাজই বা কী আজকাল। প্রত্যুষকাকুর কথা ভুলে গেলি? বাবাকে ল্যাং মারতে আমাকে তোর সঙ্গে ফ্ল্যাটে আটকে দিল, আমি বা বাবা কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিলাম প্রত্যুষকাকু এটা করতে পারে? রাজনীতিকরা কাউকে ছাড়ে না নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য"।

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পুলিশ ঢুকতে যাবে কেন?"

শুভায়ু বলল, "দিল্লির পুলিশ যদ্দিন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কন্ট্রোলে থাকবে, ততদিন এসব চলবে। সেন্ট্রালে প্রোপাগান্ডা সরকার চলছে, পিওরলি কমিউনাল"।

অঞ্জনা বলল, "আর রাজ্যে? আমার তো মনে স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ ইকোয়াল কমিউনাল"।

শুভায়ু বলল, "সে নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই। জাত পাত নিয়ে রাজনীতি করা আর আগুন নিয়ে খেলা একই ব্যাপার। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে আবার শহরে ফিরে মাইক নিয়ে সবাইকে বোঝাতে শুরু করি, আমরা এখনও পারি ঘুরে দাঁড়াতে। সমস্যা হল, তারপরেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়"।

অঞ্জনা শুভায়ুর হাত ধরে বলল, "তবু একদিন ফিরবোই। ফিরবো না আমরা?"

শুভায়ু বলল, "বাবা যদি ফিরতে চায়, আমি অফিসে অ্যাপ্লিকেশন দিতে রাজি। বাবা মনে হয় আর রাজি হবে না"।

অঞ্জনা বলল, "বাবার সঙ্গে কথা বল। বাবা কেন স্বেচ্ছাবসর নিয়ে নিল? বাবার মত লোক দরকার এখন"।

শুভায়ু বলল, "অভিমান, আর কী হতে পারে? যে লোকটা সারাজীবন পার্টির জন্য দিয়ে দিল, তাকে যদি এক্সপেল হতে হয়, এক্সপেল হবার পর কেউ কোন খবরও না নেয়, তাহলে অভিমান হয় না?"

অঞ্জনা বলল, "তবু তুমি বাবার সঙ্গে কথা বল। একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক?"

শুভায়ু মাথা নিচু করল।

সন্ধ্যেবেলাগুলোতেই বাড়ির কথা সব থেকে বেশি করে মনে পড়ে।

প্রিয়জনেরা যত কাছেই থাক, নিজের বেড়ে ওঠার বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে ভাবলে এখনও মন খারাপ করে ওঠে...

১৬।

ভোর ছ'টা।

প্রভাস ঘুমাচ্ছিলেন। ফোনটা বেজে উঠল। একজন জানাল গ্রামের মন্দিরের সামনে এক ব্যাগ মাংস ভোর রাতে কেউ রেখে দিয়ে গেছে।

প্রভাস দেরী করলেন না। তৈরী হতে শুরু করলেন। অমলার ভোরে উঠে রান্না করা অভ্যাস। রান্নাঘর থেকে প্রভাসকে তৈরী হতে দেখে বললেন, "কী হল?"

প্রভাস বললেন, "আসছি"।

অমলা আর জিজ্ঞেস করলেন না। বুঝলেন কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। এরকম তো নতুন নয়। আগেও যখন প্রভাস পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন, তখনও এরকমই কোন খবর এলে বেরিয়ে যেতেন।

বাইক নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রভাস দেখলেন ব্যাগটা ঘিরে জমায়েত হয়েছে। তিনি কোন দিকে না তাকিয়ে ব্যাগের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিড় থেকে কেউ একজন বলে উঠল, "এটা গরুর মাংস দাদা। বড় বড় পিস দেখুন, কেমন চর্বিও আছে"।

প্রভাস দাঁড়িয়ে গেলেন। ফোন বের করে বাজপেয়ীকে ফোন করলেন। বাজপেয়ী ঘুমাচ্ছিলেন। ঘটনাটা শোনামাত্র বললেন, "মন্দিরে গরুর মাংস ফেলে গেছে! এবার বুঝতে পারছেন, ওরা কত বাড় বেড়েছে? আজকেই পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করার প্রোগ্রাম করুন"।

প্রভাস বললেন, "হ্যাঁ, সে তো করবই"।

ফোন রেখে প্রভাস দেখলেন চার পাঁচজন তার দিকে এগিয়ে এসেছে। এরা গ্রামেরই লোক। প্রভাসকে একজন গম্ভীর গলায় বলল, "আপনি এখান থেকে চলে যান। সমস্যা হতে পারে"।

প্রভাস বললেন, "কেন যাব? আমি তো যাওয়ার জন্য এসেছি? যেখানে পুজো হয়, সেখানে মাংস ফেলে রেখে যাবে, আর আমরা চুপ করে থাকব?"

প্রভাসকে কয়েকজন সমর্থন করল।

প্রভাস বললেন, "আর এই যে, ফেজ টুপি পরে আমাদের মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, আমাকেই চলে যেতে বলছো, তোমাদের সাহস তো কম না! বেরোও এখান থেকে। এটা হিন্দুদের জায়গা"।

প্রভাসের এই চেহারা গ্রামের মানুষ আগে দেখে নি। তারা খানিকটা অবাক হল। একই সঙ্গে প্রভাসের মত বিচক্ষণ লোক যখন এ কথা বলেছে, তখন ঠিকই বলেছে এটাও বুঝে নিল। যে চার পাঁচজন প্রভাসের দিকে এগিয়ে এসছিল, জমায়েতের লোকজন তাদের দিকে তেড়ে গেল।

জনমতের চাপ দেখে তারা পিছু হটল। প্রভাস অতটা বোঝেন নি। চেঁচিয়ে উঠলেন, "পালাচ্ছো কেন? দাঁড়াও, কথা বলে যাও"।

মানুষের মবে পরিণত হতে বেশিক্ষণ লাগে না। এই লোকগুলো যেহেতু খানিকটা পিছু হটে গেছিল, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েকজন লোক তাদের তাড়া করল। ভিড়ের মধ্যে থেকেই "ধর ধর, মার মার" আওয়াজ উঠল

মন্দিরের সামনে উত্তেজিত জনতার ভিড় বাড়ছিল। যে যেখানে যা পেল, তা দিয়েই ওই চার পাঁচজনকে তাড়া করল।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দুজন একটা বাইকে করে পড়িমড়ি করে পালিয়ে গেল। বাকিরা জনতার হাতে পড়ে মার খেতে শুরু করল।

প্রভাসের মনে পড়ল এই চার পাঁচজন রতনকে খুনের দিনও ছিল। একবার ভাবলেন উন্মত্ত জনতাকে বাধা দেবেন। কী মনে হতে দিলেন না।

তিনটে ছেলেকে মেরে আধমড়া করে মন্দিরের সামনে ফেলে রাখা হল।

প্রভাস মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে ব্যাগটা নিয়ে বাইরে ফেলতে গিয়ে দেখলেন বিরাট বাইক বাহিনী নিয়ে আব্দুল উপস্থিত হয়েছে।

প্রভাসকে দেখে আব্দুল দৌড়ে এসে বলল, "কী হল দাদা, কী ঝামেলা হয়েছে?"

প্রভাস আব্দুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোদের ছেলেরা আমাদের মন্দিরের ভিতরে গোমাংস ফেলেছে, পাবলিক ক্ষেপে আছে"।
আব্দুল অবাক হয়ে প্রভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের ছেলেরা মানে? আমাদের দলের ছেলেরা?"
প্রভাস বললেন, "না, তোদের ধর্মের ছেলেরা। এগুলো কী ধরণের ইয়ার্কি? তোদের মসজিদের ভিতরে শুয়োরের মাংস ফেলে দিয়ে আসব? দেখবি কেমন লাগে?"
আব্দুল বলল, "এ কী ধরণের কথা বলছো দাদা? এখানে ধর্ম এল কোত্থেকে? তোমার মুখ থেকে তো কোন দিন এই ধরণের কথা শুনি নি আমি!"
প্রভাস আঙুল তুলে বললেন, "শুনিস নি কারণ আমিই বুঝি নি তোরা কী চাস। এখন বুঝতে পারি, এতদিন চোখে ঠুলি পড়ে ছিলাম। আমাকে তোরা ফাঁসিয়েছিলি এই ধর্মের কারণেই। আমি হিন্দু বলে আমাকে তোরা দুর্গা পুজো করতে দিস নি। এবার তোরা মন্দিরেও নিষিদ্ধ মাংস ফেলছিস। আমি কিন্তু আর মুখ বুজে এসব মেনে নেব না। এবার ঝামেলা হবে আব্দুল"।
আব্দুল বিস্মিত চোখে প্রভাসের দিকে তাকিয়ে রইল।
চেনা লোকটা হঠাৎ এভাবে অপরিচিত হয়ে গেল কী করে?
১৭।
ঘুম থেকে উঠে প্রত্যুষ চুপ করে বসে থাকেন কিছুক্ষণ।
অবশ্য রোজ রোজ সেটা সম্ভব হয় না। বেশিরভাগ দিনই সুভাষের মত কেউ না কেউ এসে হাত জোড় করে বসে থাকে। রাজনীতিতে এলে ধান্দাবাজ মানুষ চেনা যায়। মানুষ রাজনীতিকদের ধান্দাবাজ বলে, আসলে মানুষও কম ধান্দাবাজ নয়। প্রত্যেকেই নিজের ধান্দা রক্ষার জন্য লড়ে যাচ্ছে।
দেবযানী চা দিয়ে বসে বললেন, "কালকের বান্ডিলটা সকালে সন্তু দেখেছে। তোমাকে কত টাকা দিয়েছিল বলেছে?"
প্রত্যুষ বললেন, "দশ। কেন বল তো"?
দেবযানী বললেন, "ও বলছিল সাত মত লাগবে ওর। নেবে ওখান থেকে?"
প্রত্যুষ ভ্রু কুঁচকালেন, "কেন? ওর এত টাকা কী করতে লাগবে? ডাকো তো"।
প্রত্যুষের ছেলে সন্তুর ওবেসিটি আছে। বেশ মোটার দিকে চেহারা। প্রচুর বিয়ার খেতে পারে। বাবা ডেকেছে শুনে এসে দাঁড়াল। প্রত্যুষ বললেন, "সাত লাখ কী করতে লাগবে তোর? পেট্রোল পাম্প চলছে না?"
সন্তু বলল, "সব টাকা তো ব্যবসাতে ঢুকে গেছে। আমি ভাবছিলাম একটা এস ইউ ভি কিনব। তার জন্য হাজার ঝামেলা। আমার কাছে ওই সাত মত আছে। তুমি সাত দিলে হয়ে যায়"।
প্রত্যুষ বললেন, "এস ইউ ভি তো আছে তোর। এই ক'দিন আগেই কিনলি না?"
সন্তু বলল, "ক'দিন আগে না বাবা। দু বছর হয়ে গেছে। তা ছাড়া গাড়িতে বেশ কয়েকটা ডিফেক্ট আছে"।
প্রত্যুষ বললেন, "তার জন্য সার্ভিস সেন্টার বলে একটা বস্তু আছে। সেখানে গাড়িটা দে। ঠিক করে দেবে"।
সন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
প্রত্যুষ বললেন, "তিনটে ফোন ইউজ করিস চার লাখ টাকা দাম। গাড়ি দুদিন পর পর চেঞ্জ করতে হয়। গলায় একটা প্ল্যাটিনামের হার ঝুলিয়েছিস। তোর দাবীটা কি? তুই প্রত্যুষ সাঁতরার ছেলে না বাপী লাহিড়ীর? তোর বয়সে আমরা পালিয়ে থাকতাম। কখন নক্সালরা গুলি করে উড়িয়ে দেবে, ভয়ে ভয়ে এদিক সেদিক লুকিয়ে থাকতে হত। আর তোদের চালচলন দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় আজকাল। তুই একটা বিয়ে কর। অবশ্য বিয়ে করবি কী? কে তোকে বিয়ে করবে? তোর মত হোদল কুতকুতকে কে বিয়ে করতে যাবে? লোকের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। খেয়ে না খেয়ে চেহারা বাগিয়েছিস একটা। জিমে ভর্তি হ, তিরিশ কেজি কম কর, তারপর চিন্তা করব তোকে এস ইউ ভি দেব নাকি"।
সুভাষ দরজা দিয়ে উঁকি মারল, "আসব দাদা"?

প্রত্যুষ বললেন, “আয়”।
সুভাষ সন্তুর দিকে তাকিয়ে প্রত্যুষকে বলল, “সেরকম হলে পরে আসছি”।
প্রত্যুষ বললেন, “আসতে বলেছি, ভিতরে আয়। ন্যাকামি করতে হবে না”।
সুভাষ ঘরে ঢুকে গলায় চিনির শিরা মাখিয়ে বলল, “ভাইপোকে বকাবকি করছো কেন দাদা? একটামাত্র ছেলে। এরকম করে কথা বলে?”
প্রত্যুষ সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কী বলার আছে?”
সন্তু বলল, “জিমে জয়েন করব। কিন্তু শোরুমে অ্যাডভান্স করে দিয়েছি। তুমি টাকাটা না দিলে আমি লোণ নিয়ে নেব”।
সুভাষ বলল, “কত টাকা লাগবে ভাইপো?”
সন্তু বলল, “সাত লাখ”।
সুভাষ চুপ করে গেল। কেমন একটা বিষম মত খেল ভিতর ভিতর।
প্রত্যুষ বললেন, “কিনেই ছাড়বি?”
সন্তু বলল, “বললাম তো, অ্যাডভান্স করে দিয়েছি”।
প্রত্যুষ বললেন, “কোন শোরুম?”
সন্তু বলল, “স্টার অটো”।
প্রত্যুষ বললেন, “ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। অ্যাডভান্স ব্যাক করে দেবে”।
সন্তু মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইল।
সুভাষ বলল, “কী যে বল দাদা, এটা তো তোমার প্রেস্টিজের ব্যাপার। অ্যাডভান্স করে ব্যাক নিয়ে নেওয়া যায় নাকি? জানো দাদা, আমি কলকাতা এলে গাড়িতে তেল না থাকলেও ড্রাইভারকে বলে দি ভাইপোর পাম্প থেকেই যেন তেল নেয়। নিজেদের ব্যাপার তো। এরকম কোর না তুমি, এবার দিয়ে দাও”।
প্রত্যুষ রাগী চোখে সন্তুকে বললেন, “মার থেকে নিয়ে নে। এরপরে কোথাও অ্যাডভান্স করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে করবি”।
সন্তু ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
সুভাষ বলল, “দাদা আমারটা দেখলে?”
প্রত্যুষ শ্বাস ছাড়লেন। সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল।
১৮।
সৌমেন থানায় ছিলেন। ফোন বাজল।
ধরলেন, “হ্যালো”।
“হ্যাঁ স্যার, আমি মল্লিকপুর থেকে বলছি। যত তাড়াতাড়ি পারেন পুলিশ ফোর্স নিয়ে চলে আসুন স্যার”।
সৌমেন নড়ে চড়ে বসলেন, “মানে? কী হয়েছে?”
“দাঙ্গা কন্ডিশন স্যার”।
ডিস্ট্রিক্ট থেকে বাহিনী এনে যখন সৌমেন মল্লিকপুরে পৌঁছলেন, গোটা এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে।
বেশ কয়েকটা বাড়ি জ্বালানো হয়েছে। গ্রাম দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। হিন্দুরা একদিকে, মুসলমানেরা একদিকে।
এলাকায় র‍্যাফ নামানো হল। প্রভাস ব্যানার্জি মন্দিরে ছিলেন। তার সমর্থকরা তাকে ঘিরে রয়েছে।
সৌমেনকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠল, “ওই যে মোল্লাদের চাকর এসে গেছে”।
সৌমেনের মাথা গরম হলেও কিছু বললেন না। প্রভাস বললেন, “আমাদের মন্দির মুসলমানেরা নিষিদ্ধ মাংস ফেলে দিয়ে গেছে। এলাকায় যে ঝামেলা হচ্ছে, তার জন্য সম্পূর্ণভাবে ওরা দায়ী। আপনারা অবিলম্বে স্টেপ নিন”।

সৌমেন বললেন, "তারপরে বাড়িগুলোতে আগুন লাগল কী করে?"
প্রভাস বললেন, "জনরোষ। ওরা শুধু মন্দিরে মাংস ফেলেই ক্ষান্ত হয় নি, এখানে আমাদের হুমকি দিতেও এসেছিল। মানুষ বুঝে নিয়েছে"।
সৌমেনের ফোন বাজছিল। এস পি ফোন করছেন। সৌমেন বললেন, "হ্যাঁ স্যার"।
"কী খবর ওখানে?"
সৌমেন আলাদা হয়ে গেলেন, "কমিউনাল টেনশন আছে"।
"কারফিউ জারি করে দাও। যে কোন রকম জমায়েত নিষিদ্ধ কর। উপর থেকে অর্ডার আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক কর। কোন রকম মিডিয়াকে এন্টারটেইন করবে না। মন্ত্রী যাবেন বিকেলে। তার আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার অর্ডার আছে"।
সৌমেন বললেন, "ইয়েস স্যার"।
ফোন রেখে সৌমেন প্রভাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনারা যে যার বাড়ি চলে যান। এখানে এখন কারফিউ লাগবে"।
প্রভাস বললেন, "আর যারা মাংস ফেলেছে তাদের কী হবে?"
প্রভাসের সঙ্গে থাকা মানুষজন হৈ হৈ করে উঠল।
সৌমেন ঘড়ি দেখে বললেন, "দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। এলাকা খালি করুন"।
প্রভাস সৌমেনের চোখে চোখ রেখে বললেন, "আপনাকে আমরা দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। যারা মাংস ফেলেছে তাদের অ্যারেস্ট করুন"।
সৌমেন কয়েক সেকেন্ড প্রভাসের দিকে তাকিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলেন।
এস পিকে ফোন করে বললেন, "স্যার, সিচুয়েশন ভীষণ উত্তপ্ত"।
এসপি বললেন, "অপোজিশন থেকে ঝামেলাটা আসছে, তাই তো?"
সৌমেন বললেন, "ইয়েস স্যার"।
এস পি বললেন, "ঠিক আছে। লাঠি চার্জ শুরু করুন। অপোজিশন লিডার যে আছে, তাকে অ্যারেস্ট করুন"।
সৌমেন বললেন, "রেজিস্ট্যান্স এলে?"
এস পি বললেন, "র‍্যাফ নিয়ে গেছো তো। হটিয়ে দাও"।
সৌমেন বললেন, "ওকে স্যার"।
মিনিট দশেকই লাগল। পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে এলাকা ফাঁকা হয়ে গেল।
প্রভাসকে নিজের গাড়িতেই তুললেন সৌমেন।
প্রভাস হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন, "সব সময় ওদের কথা শুনেই চলতে হবে? গ্রামে যে দুষ্কর্মটা হল, তার বিরুদ্ধে কোন স্টেপ নিলেন না?"
সৌমেন বললেন, "নেওয়া হবে"।
প্রভাস বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, "কী রকম নেওয়া হবে তা বুঝতেই পারছি। আগামী দিনগুলো আপনাদের পক্ষে ভাল যাবে না, এটা বলে রাখতে পারি। আমাদের গ্রামে হিন্দু মুসলমান পপুলেশন সেভেন্টি থার্টি। এই ভোটের রেশিওটা মাথায় রাখতে বলুন আপনাদের অফিসার আর সরকারকে"।
সৌমেন বললেন, "হিন্দু মুসলমান পপুলেশন দেখে তো আমরা কোন এলাকা ঠান্ডা করতে যাই না। আপনি যে দলে ছিলেন, যতদিন এই এলাকায় প্রধান ছিলেন, কোনদিন সেসব দেখে পঞ্চায়েত চালিয়েছিলেন কি?"
প্রভাস খানিকটা থতমত খেয়ে গেলেন প্রথমে। তারপর বললেন, "তখন বুঝি নি যে আসলে হিন্দুদের একঘরে করে দেওয়ার জন্যই সব দল কাজ করে চলেছে। এখন বুঝতে পারছি। নইলে এত সাহস কী করে হবে যে মন্দিরে গরুর মাংস ফেলে দিয়ে যাবে?"

সৌমেন বললেন, "গরুর মাংস আপনি শিওর? আর ওখানে মুসলিমরাই মাংসটা ফেলেছে, সে ব্যাপারে কনফার্ম হয়েছেন? নাকি তা না দেখেই কয়েকজন গরীব মানুষের বাড়ি পুড়িয়ে দিলেন আপনারা?"
প্রভাস বললেন, "আমার সব জানা আছে। কী হয়েছে, কীভাবে হয়েছে সব"।
সৌমেন চুপ করে গেলেন। আর কথা বাড়ালেন না।
#
থানায় পৌঁছতে প্রভাসের মুখে হাসি ফুটল। অনন্ত বাজপেয়ী থানায় অপেক্ষা করছেন।
তারা গাড়ি থেকে নামতেই সৌমেনের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করলেন অনন্ত। সৌমেন বললেন, "বলুন"।
অনন্ত বললেন, "প্রভাসবাবুকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম স্যার। মন্দিরে গরুর মাংস ফেলা হল, মুসলমানরা আমাদের নেতাকে মারল, তার কোন বিচার হল না, অথচ আপনারা প্রভাসবাবুকে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে এলেন"।
সৌমেন বললেন, "আপনি এখান থেকে সব বুঝে গেলেন?"
অনন্ত বললেন, "আপনিও তো এখান থেকেই সব বুঝে গেলেন স্যার। এত মোল্লা থাকতে আপনাদের প্রভাসবাবুকেই অ্যারেস্ট করতে হল। আপনারা ভুলেই গেছেন খেলা ঘুরছে। দুদিন পরে আমরা ক্ষমতায় আসব, আর আপনাদের এখানেই চাকরি করতে হবে। তখন কী করবেন, সব ঠিক করে রেখেছেন তো?"
সৌমেন বললেন, "ডোন্ট টক রাবিশ। আপনাকেও আটক করতে বাধ্য হব না হলে"।
অনন্ত বললেন, "বেশ তো, অ্যারেস্ট করুন। আমার কোন আপত্তি নেই। আমাদের লোক আসা শুরু হয়েছে। স্টেট সেক্রেটারিও চলে আসবেন বিকেলের মধ্যে। যতক্ষণ না প্রভাসবাবু সুবিচার পাবেন, আপনারা থানা ছেড়ে বেরোতে পারবেন না। কথা দিলাম"।
অনন্ত হাসলেন।
সৌমেন দেখলেন বাস্তবিকই দু তিনটে বাস এসে দাঁড়িয়েছে থানার সামনে।
লোক নামছে বাস থেকে।
তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করল।
১৯।
সুভাষ প্রত্যুষের ডাইনিং টেবিলে বসে রুটি খাচ্ছিল, এমন সময় পরাগ এসে টেবিলে বসল।
সুভাষ তরকারি মুখে নিয়ে দাঁত বের করল।
প্রত্যুষ ডাইনিং রুমে এসে পরাগকে বললেন, "আসুন এ ঘরে"।
প্রত্যুষের পেছন পেছন পরাগ প্রত্যুষের বেডরুমে গেল।
প্রত্যুষ বললেন, "ব্যালান্সটা এনেছেন?"
পরাগ বলল, "আট এনেছি স্যার। বাকি দুই মাফ করে দিন প্লিজ"।
প্রত্যুষের ভ্রূ কুঁচকাল, "মানে? এটা কী ধরণের ইয়ার্কি হচ্ছে? আপনি এখানে আসার আগে জেনে আসেন নি এই এলাকায় রেট কত?"
পরাগ বলল, "এখনও বুকিং শুরু হয় নি দাদা। এখন এতো টাকা জোগাড় করা খুব অসুবিধা হয়ে যাবে"।
প্রত্যুষ বললেন, "বেশ তো, তাহলে যখন জোগাড় হবে, তখন না হয় প্রোজেক্টটা শুরু করবেন। আপাতত প্রোজেক্টটা বন্ধ করে দিন"।
পরাগ বলল, "প্লিজ দাদা, একটু কনসিডার করুন। আপনাদের পার্টির অন্য জায়গাতেও তো দিতে হবে"।
প্রত্যুষ বললেন, "আমাকে দিতে হয় না? আপনি কি কিছু না জেনে আমার সঙ্গে এসব নিয়ে তর্ক করতে এসেছেন? হয় আপনি অ্যামাউন্টটা দিয়ে যাবেন, নয়ত আপনি প্রোজেক্টটা করতে পারবেন না"।
পরাগ কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে দাদা, এই আট দিয়ে যাব?"
প্রত্যুষ বললেন, "না, দিলে একবারেই দেবেন। এখন যান"।

পরাগ মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।
প্রত্যুষের সকালটা তেতো হয়ে গেল।
সুভাষ উঁকি মারল, "আসব দাদা?"
প্রত্যুষ বললেন, "আয়"।
সুভাষ বলল, "মালদার পার্টি মনে হচ্ছে?"
প্রত্যুষ বললেন, "মালদার হলে কী হবে, বিরাট ঘুঘু। জানিস না তো এখন কী সব পাবলিক নিয়ে ডিল করতে হচ্ছে। আমাদের দেওয়ার সময় দরদাম করবে অথচ ফ্ল্যাট বেচার সময় স্কোয়ার ফুটে পাবলিকের গলা কাটবে। হার হারামির বাচ্চা হয় এই প্রোমোটারগুলো"।
সুভাষ ঘোঁত ঘোঁত করে হেসে বলল, "ঠিক স্যার। আমরা তো রবিন হুডের কাজ করছি বল দাদা? এই সব লোকের থেকে টাকা নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কি কম গরীব?"
প্রত্যুষ বললেন, "তুই কি আমাকে ব্যঙ্গ করছিস?"
সুভাষ জিভ কাটল, "ছি ছি দাদা, কী যে বল। তোমাকে ব্যঙ্গ করতে পারি? তুমি হলে আমার গুরুদেব। শোন না দাদা, এবার একটু ম্যানেজ কর না। আমি প্রধান হলে তোমার পুজোর অভাব হবে না, এটা কথা দিতে পারি"।
প্রত্যুষ বললেন, "পুজোর অভাব হবে না? কী আছে তোদের ওই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে?"
সুভাষ বলল, "জানো না দাদা নাকি জেনেও না জানার ভাব করে আছো? একী আগের দিন আছে? একেকটা পঞ্চায়েতে কম গ্র্যান্ট আসছে?"
প্রত্যুষ চিন্তিত গলায় বললেন, "তাও ঠিক। তুই আমাকে কত দিবি?"
সুভাষ বলল, "সে তুমি বিবেচনা করে যেটা ঠিক করবে। আমি তো তোমাকে বার বার বলছি দাদা, আমাকে প্রধান করা মানে তুমিই প্রধান হবে। কিছু একটা ব্যবস্থা কর"।
প্রত্যুষ বললেন, "ঠিক আছে, আমি দেখছি। এখন যে প্রধান আছে, সে সৎ?"
সুভাষ দেঁতো হাসল, "কী যে বল দাদা। সৎ আর পলিটিশিয়ান এখন এক লাইনে বসে নাকি? সে বিরাট ডাকাত। দু হাতে লুটছে"।
প্রত্যুষ বললেন, "ঠিক আছে, আমি একটু ভিজিল্যান্সে কথা বলি। তুই ডিটেলস দিয়ে যা আমাকে। ওর নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সব"।
সুভাষ খুশি হল, "সব দিয়ে যাচ্ছি দাদা"।
দেবযানী ঘরে এসে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার ফোন"।
প্রত্যুষ গলায় বিরক্তি নিয়ে ফোন ধরলেন, "হ্যালো"।
"হ্যাঁ, আমি বলছি"।
গলাটা চিনলেন প্রত্যুষ। লাফিয়ে উঠে বললেন, "হ্যাঁ বলুন"।
"শুনলাম পরাগ শর্মার প্লটে আপনি অনেক টাকা চাইছেন? কী ব্যাপার?"
"না না সেরকম কিছু না, আমি দেখে নিচ্ছি। ভাববেন না"।
"হি ইজ এ গুড ম্যান। ডোন্ট ডিস্টার্ব হিম। বুঝেছেন?"
"হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি"।
ফোনটা কেটে গেল।
প্রত্যুষ এই কয়েক সেকেন্ডেই ঘেমে গেছিলেন। ফোনটা দেবযানীকে দিয়ে বললেন, "সকাল সকাল আট লাখ লস হয়ে গেল মাইরি। এখন আগের দশেই কাজ চালাতে হবে"!
দেবযানী বললেন, "তাহলে সন্তুকে সাত লাখ দিয়ে দেব?"
প্রত্যুষের মেজাজ খিচড়ে গেছিল। বললেন, "দিয়ে দাও। সব দিয়ে দাও"।

দেবযানী ঘর থেকে বেরোলেন। সুভাষ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে গো দাদা?
প্রত্যুষ বললেন, "ঐ পরাগ শর্মা সত্যি ঘুঘু দেখলি? আমাকে রাজি না করতে পেরে ঠিক জায়গা মত চলে গেছে"।
দেবযানী আবার এসে বললেন, "ওই লোকটা এসেছে, পাঠিয়ে দি?"
প্রত্যুষ গম্ভীর গলায় বললেন, "দাও"।
দেবযানী বেরোলে বেডরুমে পরাগ ঢুকল।
বলল, "তাহলে দাদা কাজটা শুরু করি?"
প্রত্যুষ পরাগের দিকে তাকালেন। ইচ্ছা করছিল ব্যাটার মুখ পেচিয়ে একটা ঘুষি মারতে। মারা যাবে না। এই সব উঠতি প্রোমোটাররা শিখে গেছে ঠিক কোথায় পুজো দিয়ে এসে ভিত গড়তে হয়।
বললেন, "করুন"।
পরাগ হাত জোড় করল, "অনেক ধন্যবাদ দাদা। সামনের সপ্তাহেই পুজো শুরু করছি। অবশ্যই আসবেন দাদা"।
প্রত্যুষ বললেন, "যাব। সাইটে সাবধানে কাজ করবেন। লোকাল সমস্যা টমস্যা হলে তো আর উপরের লোকেরা এসে বাঁচাবে না, সেই আমার কাছেই আসতে হবে"।
পরাগ যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "বজরংবলীর আশীর্বাদে আমার লোকবলও কম নয় দাদা। সেরকম দু চারটে উচ্চিংড়ে বেশি উড়তে চাইলে গলা দাবড়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার লোক আমার আছে। আপনি শুধু মাথায় হাতটা রাখবেন। আসি দাদা"।
পরাগ হাত জোড় করে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।
সুভাষ বলল, "দেখলে দাদা, চমকে গেল"।
প্রত্যুষ নিস্ফল আক্রোশে বললেন, "শুয়োরের বাচ্চা শালা!"
২০।
শীতের সকাল। দিল্লিতে সকাল বোঝা যাচ্ছে না শীতে। সেভাবে রোদ ওঠে নি।
শীতে কাঁপতে কাঁপতে কোন মতে স্নান করে অফিসে বেরিয়েছে শুভায়ু।
তপন ড্রইংরুমে বসে কাগজ পড়ছিলেন, কলিং বেল বেজে উঠল।
উঠে দরজা খুললেন তপন। দেখলেন অনিন্দ্যর সঙ্গে একটা ছোটখাটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তপন বললেন, "এসো এসো"।
অনিন্দ্য আর ছেলেটা ঘরের মধ্যে ঢুকল।
তপন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্যকে বললেন, "এই মুখটা খুব চেনা লাগছে। কে বল তো?"
অনিন্দ্য বলল, "ওর নাম খলিল আহমেদ। আমাদের ইউনিয়নের নেতা। আপাতত ও নাকি দেশ বিরোধী স্লোগান দিয়েছে, সে জন্য ওকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওকে কি এখানে দু দিন রাখা যাবে কাকু?"
তপন বললেন, "ওহ, ওর নামটা মুসলিম, সে জন্য ওকে খুঁজছে তাই না?"
অনিন্দ্য হাসল, "হ্যাঁ। বুঝতেই পারছেন এখন মুসলিম মানেই সন্ত্রাসবাদী"।
তপন বললেন, "কেন বুঝব না? হিটলার যেমন দেশের মধ্যে খুঁজে খুঁজে ইহুদি মারত, এরা এবার তেমন সব কিছুতেই মুসলমানদের টার্গেট করছে। কী নিয়ে পড়ে খলিল?"
অনিন্দ্য বলল, "অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া নিয়ে পি এইচ ডি করছে খলিল। দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, গতকাল আমাদের সভা থেকে নাকি পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়া হয়েছে, আর সেটা খলিলের নেতৃত্বে হয়েছিল। অথচ আমাদের কাল মিটিং ছিল আমাদের ডক্টরেটে সেন্ট্রাল গ্র্যান্ট কমে যাচ্ছে তার প্রতিবাদে। সেখানে আমরা খামোখা পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে যাবই বা কেন?"

তপন বললেন, "তোমাদের দেখে আমারও কলেজ লাইফ মনে পড়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসী পুলিশ আমাদের খুঁজে বেড়াত। দেখলেই নক্সাল দেগে দিয়ে এনকাউন্টার করে দিত। এরাও তো আরবান নক্সাল না কী সব দাগিয়ে দিচ্ছে। তা ওর জামা কাপড় কিছু আছে?"
অনিন্দ্য বলল, "আমি দিয়ে যাচ্ছি"।
তপন বললেন, "ক্ষেপেছো? তুমি ওর জামা কাপড় আনতে গেলে ওরা বুঝে যাবে তুমি ইনভলভড আছো। কোন দরকার নেই। খলিলের জামা কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভাবা যায়, আজকাল ধর্ম নিয়ে লোক জনের কত সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা যখন পালিয়ে বেড়াতাম, কত মুসলিম বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি। দেশটার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই যে মেধাবী সব ছাত্র, এরা নাকি দেশদ্রোহী, এরা নাকি দেশের ক্ষতি করবে। ভাবা যায়?"
অনিন্দ্য বলল, "খলিলের রেজাল্ট খুবই ভাল। মাস্টার্সে ওর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছিল"।
তপন বললেন, "স্বাভাবিক। পড়াশুনায় ভাল না হলে এসব ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি নেবে কী করে? শুনছো?" তপন গলা তুললেন।
শ্যামলী এলেন।
তপন বললেন, "অনিন্দ্যকে তো তুমি চেনো। এই ছেলেটির নাম খলিল আহমেদ। আপাতত দেশদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত। পুলিশ খুঁজছে। আমাদের পার্টির কমরেড। দুদিন থাকবে। এখন এদের কিছু খাবার দেওয়া যাবে?"
শ্যামলী বললেন, "দেখছি"।
শ্যামলী ঘরের ভিতরে গেলে তপন বললেন, "যারা দেশ বদলানোর স্বপ্ন দেখবে, তাদের পালিয়ে থাকতে হবে এ তো জানা কথা। রাষ্ট্র তোমাদের কথা শুনবে কেন? তোমরা পড়াশুনা করে দেশের বাইরে চলে যাবে, কেন্দ্রে যেই থাক, তার স্তুতি করবে, এরা তো তাই চায়। বামপন্থীদের তেতো কথা কারো ভাল লাগার কথা না"।
খলিল হিন্দিতে বলল, "আঙ্কেল আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?"
তপন বললেন, "অভ্যাস আছে বললাম তো। তোমার মত আমরাও এককালে পালিয়েছি। আমি আর আমার এক বন্ধু ছিল, প্রত্যুষ নাম তার। একবার নাগেরবাজারে গেছি, খবর পেলাম পুলিশ আমাদের খুঁজছে। খড়, মানে গরুর খাবারের গাড়িতে লুকিয়ে নবদ্বীপ চলে গেছি। সেখানে এক গ্রামে, এক পার্টি কমরেডের বাড়িতে তিনদিন ছিলাম। দেশদ্রোহী ডেফিনিশন দিচ্ছে ওরা। কেন? তুমি শুধু মুসলমান বলে? দেশের সংবিধান কিন্তু তা বলে না। এ দেশ যেমন একজন হিন্দুর, তেমনই একজন মুসলমানেরও। দেশের নেতারা যদি সেটা ভুলে যায়, তবে তাদের সেটা দেশের নাগরিকদেরই মনে করিয়ে দিতে হবে। থাকো এখানে তুমি খলিল, নিশ্চিন্তে থাকো। এখানে তোমার কোন চিন্তা নেই"।
অনিন্দ্য আশ্বস্ত হল, "বাঁচালেন কাকু"।
তপন হাসলেন, "বাঁচানোর কিচ্ছু নেই। একজন মানুষকে আশ্রয় দেওয়া আরেকজন মানুষের কর্তব্য। যাক, ভালই হল, ঢেকি দিল্লি এসেও ধান ভানল তবে"।
অনিন্দ্য হেসে ফেলল।

২১।

রাত নেমেছে গ্রামে। প্রভাস কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন। অনন্তর গাড়ি তাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। গোটা গ্রামে র‍্যাফ নেমেছে। প্রভাসের বাড়ির সামনে সিকিউরিটি বসেছে। গ্রামে বেশ কয়েকজন ঘর ছাড়া।
হাত পা ধুয়ে প্রভাস খেতে বসেছেন।

অমলা ভাত বেড়েছেন। গরম ভাত। ডাল, কাতলা মাছের ঝাল। অমলা কিছুতেই প্রভাসের সঙ্গে খান না। প্রভাস বার বার অনুরোধ করেন, কিছুতেই শোনেন না। এত রাতেও প্রভাসকে একাই খেতে বসতে হল।

অমলা বললেন, “তুমি আমাকে আজকে একবারও ফোন কর নি। অন্যের কাছ থেকে শুনতে হয়। টেনশন হয় না?”

প্রভাস বললেন, “ঠিক আছে, আমি এর পরের বার তোমাকে ফোন করে দেব। খুব টেনশন গেল। আমি মন্দিরের কাছে না থাকলে আরো ঝামেলা বাড়ত”।

অমলা বললেন, “গ্রামে কখনো মন্দির নিয়ে ঝামেলা হবে, ভাবতে পারি নি”।

প্রভাস ভাত মাখতে মাখতে বললেন, “চোখে কাপড় পরিয়ে রেখেছিল এতদিন পার্টি। সেই জন্য বোঝো নি। তাছাড়া এদের হাল দেখো না! এত দিন যে পার্টির জন্য এত কিছু করলাম, দরকার পড়লে একটা সাহায্য পর্যন্ত করল না। এখন শুনলাম আমিনুল হাসান নাকি পাল্টি মারছে। নিজেরাই থেকে পার্টিটার বারোটা বাজাল”।

অমলা বললেন, “তা সে তোমার পার্টি যাই করুক, আমার অল্পবুদ্ধিতে বলে এরকমটা আগে ছিল না”।

প্রভাস বললেন, “ছিল না, এখন হবে। সময় পাল্টাচ্ছে। আমরা আর কতটাই বা বুঝি? আগে একরকমভাবে এ দেশ চলত। এখন আরেকরকমভাবে চলবে। মানুষের চিন্তা ভাবনা পাল্টাচ্ছে। তার সঙ্গে আমাদেরও পাল্টাতে হবে”।

অমলা বললেন, “তোমার ঐ অনন্ত লোকটাকে ভাল লাগে?”

প্রভাস বললেন, “যেমনই হোক, কঠিন সময়ে যে পাশে থাকে, সে বন্ধু হয়। ওর থেকে যে সব কথা শুনি, তা অবাক করার মতই। তুমি জানো আরব থেকে টাকা আসে যাতে এদেশে হিন্দুদের উৎখাত করা যায়?”

অমলা বললেন, “সেকী? তা তো জানতাম না!”

প্রভাস মাথা নেড়ে বললেন, “তবে বলছি কী? হিন্দুরা থাকলে অনেকের অনেক অসুবিধা”।

অমলা বললেন, “কী অসুবিধা গো?”

প্রভাস বললেন, “সে তুমি ভাবতে পারবে না। তুমি আব্দুলকে দিয়েই দেখো। আমাদের একটা মাত্র মেয়ে। আর আব্দুলের সাতটা ছেলে মেয়ে। এভাবেই ওরা এদেশে নিজেদের লোক বাড়িয়ে চলেছে। একদিন এরকম আসবে, ওরা আমাদের থেকে বেশি হয়ে যাবে। তখন ওরা আমাদের ওপর রাজত্ব করবে”।

অমলা বললেন, “করলে করবে! আব্দুল তো ছেলে খারাপ না। যদি রাজত্ব করে, তাহলে অসুবিধার কী আছে?”

প্রভাস বিরক্তি সহকারে বললেন, “উফ, তোমাকে বুঝিয়ে উঠতে পারব না। পরে বোঝাবো”।

অমলা বললেন, “তাই বুঝিও”।

খেয়ে উঠে প্রভাস হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকলেন। ফোন বাজছিল। দেখলেন অঞ্জন ফোন করছে। অঞ্জন তার আগের পার্টির নেতা। সংগঠন দেখেন। প্রভাস ফোন ধরলেন, “বলুন”।

অঞ্জন বললেন, “এ কী শুনছি প্রভাস? তুমি নাকি এখন হিন্দু নেতা হয়েছো? আমি তো টিভিতে দেখে থ হয়ে গেলাম! এসব কবে কীভাবে ঘটল?”

প্রভাস বললেন, “আপনার এতদিন পর সময় হল বলুন? যখন রতনকে খুনের মিথ্যা অভিযোগে আমার কোমরে দড়ি পরিয়ে পুলিশ জেলে ঢোকাল তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এতদিন পরে টিভি দেখে আমার কথা মনে পড়ল আপনার বলুন? এভাবে আপনারা গ্রামের লোকেদের সঙ্গে পাশে থাকছেন, তাই তো?”

অঞ্জন বললেন, “শোন শোন প্রভাস, তোমার ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ আছে। তা বলে তুমি যে পথটা বেছেছো, সেটা কিন্তু খুব ভয়ংকর একটা পথ। সেটা বুঝতে পারছো তো?”

প্রভাস বললেন, "আমার বুঝে কাজ নেই। আপনারা ঘুমিয়ে থাকেন। দরকারে আপনাদের কাউকে পাওয়া যায় না। এখন যাত্রাদলের বিবেক সাজতে এসেছেন। পার্টির প্রতিটা ব্রিগেডে বাস ভরিয়েছি। নিজের ট্যাকের টাকা খরচ করে গ্রামের সবাইকে নিয়ে যেতাম। আর যখন ওরা আমার নামে মিথ্যা কেস দিল, আপনারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আপনাদের সঙ্গে আমার আর কোন কথা নেই। ভাল থাকবেন"।

ফোনটা কেটে দিলেন প্রভাস। অঞ্জন আরো দুবার তাকে ফোন করলেন। প্রভাস ধরলেন না।

২২।

"গাদাগুচ্ছের টাকা ঢুকে গেছে রে সোহিনী। প্লিজ কিছু কর"।

প্রীতম কাতর স্বরে বলল।

সোহিনী বলল, "তুমি আমাকে কেন বলছো প্রীতমদা? সরাসরি বিপুলদার সঙ্গে কথা বল। তুমি তো জানোই আমি কিছু করতে পারব না"।

প্রীতম বলল, "বলব। কিন্তু আমি কথা বলতে গেলে এখন যে ঝামেলাটা পোহাতে হবে, সেটা নিতে পারব না বিশ্বাস কর। তুই মধ্যস্থতা কর। তুই তো জানিস ফোরামের থেকে লোক নিয়ে করলে এখন কী সমস্যা হচ্ছে। গাদা গুচ্ছের টাকা তো দিতেই হচ্ছে, এদিকে পুরোটা ওদের মর্জিমতো চলতে হবে"।

সোহিনী ক্লান্ত গলায় বলল, "শুধু আমি কেন, সবাই সব জানে প্রীতমদা, কিন্তু এই মুহূর্তে বিপুলদাকে বাদ দিয়ে তুমি এত বড় কাজ করে ফেললে, আমি তো রাজনীতিতে রয়েছি একজন অতিথি শিল্পীর মত, আমার কী ক্ষমতা আছে?"

প্রীতম বলল, "গোটাটাই সিন্ডিকেটরাজ চলছে। শুধু টাকা লোটার ধান্দা। তোকে বললাম বলে মনে করিস না কিছু"।

সোহিনী বলল, "টেল মি সামথিং নিউ প্রীতমদা। এ সমস্ত কিছুই আমি জানি। নিজের ইচ্ছায় ভোটে দাঁড়াই নি"।

প্রীতম বলল, "তুই প্লিজ ফোন কর বোন আমার। প্লিজ বাঁচা আমাকে"।

সোহিনী বলল, "ঠিক আছে দেখছি"।

বিপুলকে ফোন করল সোহিনী। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর ধরলেন বিপুল, "হ্যাঁ বল"।

সোহিনী বলল, "ফাঁকা আছো বিপুলদা?"

বিপুল বললেন, "একটু কাজ ছিল। রাত দশটার দিকে ফাঁকা হব। কেন?"

সোহিনী একটু থেমে বলল, "প্রীতমদা বসতে চাইছিল তোমার সঙ্গে। আমিও থাকলাম"।

বিপুল বললেন, "ওহ! তোমায় ধরেছে এখন?"

সোহিনী বলল, "হ্যাঁ, বলল তুমিই পারো এই বিপদ থেকে ওকে বাঁচাতে"।

বিপুল বললেন, "বুঝেছি। এতদিনে মনে পড়ল আর কী। বলে দাও হবে না"।

সোহিনী গলায় মধু ঢালল, "প্লিজ বিপুলদা, এখানে আমার প্রেস্টিজও জড়িয়ে। লিড রোল আছে, সিনেমাটাও ভাল। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে তোমার নাম অবশ্যই যাবে"।

বিপুল বলল, "ওসব ছেঁদো কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আমার কিছু হবে না। ওকে বল পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে আসতে পারলে আসে যেন। নইলে আসার দরকার নেই। আমার সময়ের দাম আছে"।

সোহিনী "আচ্ছা" বলে ফোন রেখে ঠোঁট কামড়াল।

প্রীতম আগ্রহী গলায় বলল, "কী বলল?"

সোহিনী বলল, "পাঁচ লাখ"।

প্রীতম চোখ উল্টে বলল, "বলিস কী?"

সোহিনী প্রীতমের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে বার বার বলেছিলাম এই কাজটা কোর না। তুমি বললে ঠিক উতরে দেবে। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা যায়?"

প্রীতম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "পাঁচ লাখ আমি কোথায় পাব? বিপুলদাকে বাইপাস করে যদি প্রিয়ব্রতদার কাছে যাই? প্রিয়ব্রতদা বললে বিপুলদা ফেলতে পারবে না, বল?"
সোহিনী বলল, "আমি জানি না। তোমার সিনেমা, তোমার কেরিয়র, তোমাকে ঠিক করতে হবে কী করবে"।
প্রীতম মাথায় হাত দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "শোন না, এই পাঁচ লাখে তো তোরও কিছু ভাগ থাকবে বল? তুই তোর ভাগটা ছেড়ে দে না। তাহলে কিছুটা কমবে"।
সোহিনীর সাধারণত চোখে জল আসে না। এ কথাটায় হঠাৎ করে চোখে জল এসে গেল। যে লোকটা এই কিছুক্ষণ আগে তাকে বোন বলল, সেই এত বড় একটা কথা বলতে পারল? সে টাকা নেবে? এত দিনে তাকে এই চিনল এরা?
পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। এত দিনে দুটো জিনিস শিখেছে সোহিনী। এক, জীবনে কারো থেকে বেশি কিছু আশা করতে নেই; দুই, কারো কোন কথাতেই ভেঙে পরে রিয়্যাক্ট করতে নেই।
সে বলল, "এই পাঁচ লাখ কেন, বিপুলদার কাছে যাওয়া কোন টাকাতে আমার কোন হিস্যা থাকে না। চাইলে তুমি বিপুলদাকে জিজ্ঞেস করেও যাচাই করে নিতে পারো"।
প্রীতম বলল, "এবাবা তুই রেগে যাচ্ছিস কেন? বুঝছিস না আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে? প্লিজ কিছু মনে করিস না। আমি দেখছি কিছু একটা ব্যবস্থা করে। রাগিস না বুঝলি তো?"
সোহিনী থমথমে মুখে মাথা নাড়ল।
২৩।
"দল ডুববে প্রত্যুষ। আমি গন্ধ পাচ্ছি"।
মিটিং শেষে বেরোচ্ছিলেন প্রত্যুষ। হঠাৎই সাগ্নিক হাজরা তাকে ডেকে কথাটা বললেন।
প্রত্যুষ অবাক গলায় বললেন, "কেন মনে হচ্ছে এটা?"
সাগ্নিক বললেন, "আমাকে উল্টোডাঙা নামিয়ে দেবে? রাস্তায় যেতে যেতে কথা বলব"।
প্রত্যুষ বললেন, "নিশ্চয়ই। ভালই হবে। চলুন"।
সাগ্নিক প্রত্যুষের গাড়িতে উঠলেন। প্রত্যুষ বললেন, "এখানে নিশ্চিন্তে বলতে পারেন। আমার ড্রাইভার পুলকদা কানে কম শোনেন। রাজনীতিও তেমন বোঝেন না"।
সাগ্নিক বললেন, "তা ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা ওপেন সিক্রেট। তুমিও জানো খানিকটা"।
গাড়ি স্টার্ট নিল।
প্রত্যুষ অবাক হয়ে বললেন, "কীভাবে জানি?"
সাগ্নিক বললেন, "বঙ্গদেশে দিল্লির প্রবেশ ঘটছে। এবং দ্রুত গতিতে। দল ভাঙবে"।
প্রত্যুষ বললেন, "ধুস। সে দিল্লি দূর অস্ত। তবু শুনি আপনি ঠিক কেন বলছেন"।
সাগ্নিক বললেন, "প্রথমত একটা দল তৈরী হয়েছিল একজনের উপরে। নীতি আরেকটা দলের বিরোধিতা করা"।
প্রত্যুষ বললেন, "হু"।
সাগ্নিক বললেন, "তারপর সে দলটা ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দল থেকে লোক আসা শুরু হল। বেসিকালি যে দলের বিরোধিতা করার জন্য দলটা তৈরী হয়েছিল, সেই দলটা নেতৃত্বহীনতায় ভুগতে ভুগতে রাজ্যে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। হানিমুন পিরিয়ড কেটে গেছে। অবাধ দুর্নীতি আর বিরোধীহীনতা মানুষ নিতে পারছে না। অন্যদিকে কেন্দ্রের দলটা গুটি সাজাচ্ছে, তারা ব্যবসা বোঝে। উইদাউট ইন্টারেস্ট পশ্চিমী ব্যবসাদারেরা এ রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট করবে কেন? যেখানে কেন্দ্রের দলটা একসময় এ রাজ্যের কোন ব্যাপারেই মাথা গলাচ্ছিল না, এখন ছোটখাটো ব্যাপারে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে"।
প্রত্যুষ বললেন, "সেটা তো দেখতে পারছি। আসল কারণটা ঝেড়ে কাশুন"।

সাগ্নিক বললেন, "আমাদের দলের বেশ কয়েকজন দিল্লিতে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই একটা ফোন পেলাম, পরিচিত একজনের। বহুদিন ধরে এ রাজ্যে বিরোধী রাজনীতি করছেন, এখন দল বদলে ফেলেছেন। তিনি বললেন সামনেই দিল্লিতে প্রেস কনফারেন্স আছে। যারা যারা জার্সি পাল্টাতে চাইছেন, তাদের সেখানে দেখা যাবে"।

প্রত্যুষ নড়ে চড়ে বসলেন, "সিবিয়াই কি আবার হানা দেবে বলছেন?"

সাগ্নিক বললেন, "এ রাজ্যে সিবিয়াই হল জল ধর জল ভরোর মত রেইড কর, দলে ভর পদ্ধতি। যে নেতার জেলে যাওয়ার ভয় আছে, তার দিকে সিবিয়াই লেলিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে হয় আমাদের দলে এসো, নয় জেলে যাও। সে সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছে। আমি শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করা লোক প্রত্যুষ। আমাদের মত যারা শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করে, তারা গন্ধ পায়। কারো পতন আর কারো উত্থানের গন্ধ পায়। আমার স্পেকুলেশন ভুল হয় না"।

প্রত্যুষ বললেন, "চৌত্রিশ বছর যে এই সরকার টিকবে না সেটা তো জানা কথা। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। দলটা কবে পাল্টাতে হবে?"

সাগ্নিক হাসলেন, "আমাকে সবাই হাওয়া মোরগ বলে। হাওয়া মোরগ মানে কী? হাওয়া বুঝে ঝুঁটি সহ পাল্টি খাওয়া"।

প্রত্যুষ বললেন, "বুঝলাম না"।

সাগ্নিক বললেন, "উল্টোডাঙা যেতে চাইলাম কেন? তুমি তো অন্য দিকে যাবে। আমি ওখান থেকে এয়ারপোর্ট যাব। রাতের ফ্লাইটে দিল্লি"।

প্রত্যুষ হাঁ হয়ে গেলেন, "আপনি..."

সাগ্নিক বললেন, "হ্যাঁ, আমি দল পাল্টাচ্ছি। এই উইকেই। কাউকে কিছু বলি নি। তোমাকেই বললাম, আমি জানি তোমায় বিশ্বাস করা যায়"।

প্রত্যুষ বললেন, "এখনই দল পাল্টাবেন? পতন কি এতই আসন্ন?"

সাগ্নিক বললেন, "অনেকটাই। প্রথমে ভেবেছিলাম দল পাল্টালে তো গাদাগুচ্ছের ফেক কেস দিতে পারে। দিল্লিতে সে ব্যাপারে কথা বললাম। তারা বললেন এই মুহূর্তে এত সিবিয়াইএর ভয় আছে এদের, তাদের দলের কোন নেতার নামে কেস শুরু হলেই কুমীর তুলে দেখানোর মত একবার করে সিবিয়াইএর জুজু দেখিয়ে দেয়। সব শান্ত হয়ে যায়। জাস্ট এখানেই লালের সঙ্গে এদের ডিফারেন্স বুঝলে? এত বছর ক্ষমতায় থাকলেও একটা সলিড কেস খাঁড়া করতে পারল না তাদের এগেইন্সটে। আর মাত্র এই ক'টা বছর ক্ষমতায় থেকে দিল্লি থেকে শুধু একবার ঝোলা থেকে ফকির সাহেব সিবিয়াই নামক জুজুটিকে বার করেন। গোটা রাজ্য হেলে যায়। অনেস্টি বিজ্ঞাপন দেওয়ার জিনিস না। সেটা থাকলে এমনিতেই সবাই ভয়ে থাকবে। না থাকলে এই হাল হবে। কিচ্ছু করার নেই, বালির ঘরের মতই এই দুর্গ একদিন পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। মিলিয়ে নিও শুধু"।

প্রত্যুষ চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন।

২৪।

গৌতম চেম্বারে কাজ করছিলেন।

টেবিলে রাখা ল্যান্ডলাইনটা বেজে উঠল।

গৌতম ধরলেন, "হ্যালো"।

"কী খবর আপনার?"

সিদ্ধার্থ আগরওয়াল। তাদের সংবাদপত্রের মালিক। যখন সিদ্ধার্থ এই কাগজের মালিকানা নিয়েছিলেন, গৌতমকে বলেছিলেন তিনি কাগজের ইন্টারনাল ব্যাপার নিয়ে নাক গলাবেন না। পেপারে কী খবর যাবে,

সেসব দেখবেন না। তেমন ফোনও করেন না সিদ্ধার্থ। হঠাৎ করে সিদ্ধার্থর ফোনে গৌতম খানিকটা অবাক হলেন।

"খবর ঠিকঠাক। সকাল সকাল আমার কথা মনে হল যে?"

সিদ্ধার্থ বললেন, "আমি কলকাতায় এসেছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?"

"সিওর। কোথায় যেতে হবে বলুন"।

সিদ্ধার্থ বললেন, "অফিসের বাইরে আমার গাড়িটা পার্ক করা আছে। কাইন্ডলি যদি চলে আসেন"।

গৌতম অবাক হলেন। এরকম তো কোন দিন হয় নি। বললেন, "শিওর, আমি আসছি"।

অফিসে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে বেরোলেন গৌতম। নিচে একটা সাদা রঙের হোন্ডা সিটি দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখা মাত্র গাড়িটার দরজা খুলে গেল।

গৌতম দেখলেন গাড়ির ভিতর সিদ্ধার্থ বসে আছেন। সিদ্ধার্থ বললেন, "গুড মর্নিং। আসুন"।

সিদ্ধার্থ মাঝবয়েসী। মুম্বইতে বেশিরভাগ সময় থাকেন। স্টক এক্সচেঞ্জের অন্যতম কিং বলা যেতে পারে তাকে। কলকাতায় বেশ কিছু ইনভেস্টমেন্ট আছে তার। ঝরঝরে বাংলা বলেন।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

সিদ্ধার্থ বললেন, "কাগজের ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল মিস্টার সেন"।

গৌতম বললেন, "বলুন"।

গাড়ির এসিটা বেশ ঠান্ডা করছে। হীমশীতল করে রেখেছে একেবারে। এ সমস্ত লোকেদের বোধ হয় বেশি গরম লাগে।

টাকার গরমই হবে।

সিদ্ধার্থের চোখে মুখে ঘাম আছে। রুমাল বের করে সে ঘাম মুছে সিদ্ধার্থ বললেন, "আমাদের পেপারে ফেক নিউজ বাস্টার বলে যে কলামটা বেরিয়েছে, সেটা নিয়ে আমাকে দিল্লি থেকে ফোন করেছিল"।

গৌতম মনে মনে বললেন, "আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল তুমি শালা এই জন্যই ডাকবে। শিওর হুড়কো পড়েছে"। কিছুই বুঝতে পারেন নি, এমন মুখ করে বললেন, "দিল্লি থেকে? কে ফোন করেছিল?"

সিদ্ধার্থ বললেন, "দেখুন সেন, আমরা বিজনেসম্যান। আমাদের করে খেতে হয়। কিছুটা হলেও ব্যালান্স করে চলতে হয়। মিডিয়া ইজ দ্য ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্র্যাসি না কীসব লোকজন বলে, ওসব নিয়ে ভাবলে আমাদের হবে না। আমাদের নিউজ পেপার যদি সেন্ট্রালের পার্টিকে খেপিয়ে দেয়, দেন আই উইল বি ইন বিগ ট্রাবল। মল্লিকপুর না কোথায় কী হয়েছে না হয়েছে, তা নিয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করার দরকার কী ছিল? হোয়াটস অ্যাপে তো অনেক কিছুই বেরোচ্ছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই ঝুটো নিউজ। আমরা কি এখন সে সব নিউজ ঠিক না ভুল সেটা দেখতে যাব? আপনাকে আমার অনুরোধ, প্লিজ স্টপ দিস শিট নাও"।

গৌতম বললেন, "আপনাকে কে কী বলেছে জানতে পারি কী?"

সিদ্ধার্থ বললেন, "দেখুন মিস্টার সেন, আপনাকে ক্লিয়ার করে বলে রাখি, দে আর নাও টারগেটিং দিস স্টেট। দে আর ইনভেস্টিং হিয়ার, দে আর গেটিং এনগেজড ইন এভ্রি সেক্টর হিয়ার। আমার একটা রিয়াল এস্টেট প্রোজেক্ট চলছে ইউ পি তে। ওরা যদি সেটা বন্ধ করে দেয় তখন আমি নিউজপেপারই বা চালাবো কী করে, আর আপনাদের মাইনেই বা দেব কী করে?"

গৌতম কাঁচের বাইরে দিয়ে শহরটা দেখলেন। শহর বাড়ছে। পাঁচ তারা হোটেল বাড়ছে, জৌলুস বাড়ছে। এ শহরটা বদলে যাচ্ছে।

গৌতম বললেন, "একটা জায়গা থেকে রায়টের ইন্ধন দেওয়া হবে, অরগানাইজড ওয়েতে ফেক নিউজ ছড়ানো হবে, আর আমরা কিছু করব না"?

সিদ্ধার্থ বললেন, "তার জন্য লোকাল এডমিনিস্ট্রেশন আছে। তারা কি কিছু করছে মিস্টার সেন? আপনিই বলুন, সেভাবে এদের এগেইন্সটে স্টেপ নিতে দেখছেন? এর কারণ হল দে আর কমপ্রোমাইজড অলসো।

আমি আপনি কেন খামোখা শহীদ হতে যাব? আমি আপনাকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করি, কোন রকম বসিং করতে চাই না আপনার উপর। আমি শুধু আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি এই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখার জন্য। আমি কি ভুল কিছু বলেছি?”

গৌতম কয়েক সেকেন্ড গম্ভীর হয়ে ভেবে নিয়ে বললেন, “তাহলে মল্লিকপুরের ঘটনা নিয়ে কোন অ্যাপোলজি পোস্ট করতে হবে কি?”

সিদ্ধার্থ বললেন, “কিচ্ছু হবে না। যা হয়েছে হয়েছে। আমরা ফিউচারে যেন আর এসবের ভিতরে না জড়াই, সেটা এনশিওর করুন। বাকিটা আমি বুঝে নেব। বিলিভ মি সেন, আজকের দুনিয়ায় কেউ নিজের ধান্দা ছাড়া চলে না। আমি আপনাকে বলছি, যেদিন বুঝব আমাদের হাতে সেই অপশন আছে টু স্পিক এগেইন্সট দ্য গভর্নমেন্ট, আমি নিজে আপনাকে বলব গো এহেড। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। দে আর টারগেটিং দিস স্টেট অ্যান্ড বিলিভ মি, দে উইল গেট ইট বাই এনি মিনস। প্লিজ, অকারণ এসবে আর জড়াবেন না”।

গৌতম ঘাড় নাড়লেন, “ওকে স্যার। অ্যাজ ইউ উইশ”।

সিদ্ধার্থ খুশি হয়ে বললেন, “থ্যাংক্স সেন। চলুন, কোথাও বসে ভাল কোয়ালিটির সিঙ্গল মল্ট খাওয়া যাক”।

২৫।

“আমরা জানি, ওরাও জানে, সবাই কমপ্রোমাইজড হবে। কারো নামে দুর্নীতির কেস আছে, কারো খুনের, কারো বা অন্য স্বার্থ আছে। কিন্তু কিছু মানুষ থাকবে, যারা লড়াই ছাড়বে না। যারা শেষ দিন অবধি তাদের সীমিত সামর্থ দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। তারাই সাচ্চা কমিউনিস্ট। ওরা এই জন্য আর সবাইকে ছাড়লেও আমাদের ছাড়বে না। ওদের মূল টার্গেট আমরা। আর কেউ না। কমিউনিস্ট পার্টি তোমার কবে থেকে ভাল লাগল খলিল?”

খলিলের সঙ্গে বসে টিভি দেখছিলেন তপন। নিউজ চ্যানেলে দেখাচ্ছিল খলিল সহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নেতা ফেরার হয়েছে। দিল্লি পুলিশ তাদের খুঁজছে।

খলিল বলল, “আমি কোন দিন সেভাবে কিছু ভাবি নি আঙ্কেল। খানিকটা এই ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করার পরে বন্ধুদের থেকে কমিউনিস্ট লিটারেচর পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখান থেকেই ইচ্ছাটা জাগতে শুরু করেছিল। পরের দিকে যখন বুঝতে শুরু করলাম এখন যারা এ দেশ শাসন করছে, তারা আসলে ধর্মটাকে ব্যবহার করে দেশের সংবিধানটাকেই পাল্টাতে চাইছে, দে হ্যাভ ফার বিগার প্ল্যান টু মেক দিস কান্ট্রি এ হিন্দু তালিবানি স্টেট, তখন আমি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম”।

তপন বললেন, “কিন্তু যেহেতু তোমার নামটা আরবী, তাই দেশের রক্ষকরা তোমায় পাকিস্তানী বানিয়ে দিল। খুব সহজ সমীকরণ। এই সমীকরণেই ওরা কাশ্মীরিদের পাকিস্তানী বানিয়ে দিচ্ছে। দেখো, এদের কাছে দেশের দু জায়গার মানুষ কীভাবে দুরকম ট্রিটমেন্ট পায়, একদিকে ওরা ইস্যু করছে কাশ্মীরি পন্ডিতদের কাশ্মীরি মুসলমানেরা কাশ্মীর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফাইন। খুব খারাপ হয়েছে। অন্যদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পাহাড়ি জায়গা থেকে কিন্তু বহুকাল বাঙালি খেদানো হয়েছে। সেখানে ওরা গোর্খাল্যান্ডকে সাপোর্ট করছে। একইভাবে অসম, মেঘালয়তেও এরা অ্যান্টি বাঙালি স্টেপ নিয়েছে। এর কারণ খুব সিম্পল। এরা কোন রকম নীতি নিয়েই চলে না। যেন তেন প্রকারেণ এদের নীতি হল মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা। যে কোন কারণে হোক, হিন্দু মুসলমান হোক, উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণ হোক, রিজারভেশন হোক, এদের কাজই হল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা। গোবলয়ের কোন কোন জায়গায় উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্ন বর্ণের মানুষদের এখনো মানুষ বলেই মনে করে না। আমরা অনেক ভাগ্যবান যে এমন একটা জায়গায় থাকি যেখানে এই ভয়াবহ অবস্থাটা দেখতে হয় না”।

খলিল বলল, “আমি দেখেছি। আমাদের গ্রামে এখনো মুসলিমরা কুয়ো থেকে জল নিতে পারে না। এখানে আসার পরে দেখেছি ইয়ং জেনারেশন আম্বেদকরজীকে নিয়ে বিদ্রূপ মন্তব্য করে, মজা করে। এরা বোধহয়

জানেই না, চার দেওয়ালের ভিতরে যে পৃথিবীটার মধ্যে এরা বড় হয়েছে, সত্যিকারের পৃথিবীটা তার থেকে কতটা আলাদা। আমার নামে যে সব চার্জ ওরা বসিয়েছে, তাতে বলা হচ্ছে আমি নাকি আল কায়েদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। প্রথমে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। পরে হাসিই পেল। সত্যিই তো, এরা আর কীই বা করতে পারে? আমার মত ছাত্রদের নামে ফেক কেস দেওয়া ছাড়া এদের আর কীই বা করার ক্ষমতা আছে”।

তপন বললেন, “হু, আর এদের বর্ণিত আদর্শ দেশে মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে গো মূত্র খাবে, গোবর জলে স্নান করবে, সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হয়ে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করবে আর তারপরে এদের নেতা গিয়ে আমেরিকান গরুখোর প্রেসিডেন্টের পা চেটে বশ্যতা স্বীকার করবে। একজ্যাক্টলি এরা এটাই পারে। সুখের কথা হল, এরা একটা সীমা অবধি বাড়তে পারবে। আজকে বাড়বে, কালকে বাড়বে। কিন্তু দেশের মানুষেরও চোখ একদিন ঠিকই খুলবে। তারা বুঝতে পারবে দুধ কলা দিয়ে কাকে পুষছে তারা। যদি না ততদিনে সংবিধানটাই এরা পাল্টে দেয়। সেটা না পাল্টাতে পারলে এদের শেষের সেদিন ভয়ংকর হবে। রাজনীতি হোক কিংবা জীবন, অসৎ মানুষেরা কখনো শান্তি পায় না। জেনারেল ডায়ারের মত না হোক, কোন না কোন ভাবে এরা ঠিকই শাস্তি পাবে। মানুষে মানুষে যারা ভেদাভেদ তৈরী করে, কতদিন আর মানুষ তাদের সহ্য করবে। শেষ তাদের হবেই। হতেই হবে”।

শ্যামলী চা নিয়ে এলেন। তপন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি হেঁটে আসি। খলিল টিভি দেখুক। বাড়িওয়ালা এলে ওকে ঘরের ভেতর পাঠিয়ে দেবে। ওকে যেন বাইরের কেউ দেখতে না পায়”।

২৬।

ভোর হয়েছে।

অমলা রান্না বসিয়েছেন।

প্রভাসের ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ করেই। শীতের সকাল। কুয়াশা জড়িয়ে আছে চারদিকে।

অমলা প্রভাসকে উঠতে দেখে বললেন, “তুমি কি আবার বেরোবে?”

প্রভাস বললেন, “নাহ। এখন অবধি তো কোন ফোন আসে নি। তার মানে ঠিকই আছে হয় তো”।

অমলা বললেন, “একা বেরিও না। ভয় হয়”।

প্রভাস বললেন, “আমি যখন জেলে ছিলাম, তোমার লজ্জা হত?”

অমলা বললেন, “লজ্জা কেন হবে? আমি তো জানতাম কাজটা তুমি কর নি। লজ্জা হবার তো কোন কারণ নেই। কষ্ট হয়েছে। তুমি জেলের ভিতরে কী করতে ভেবে ছটফট করেছি”।

প্রভাস বললেন, “জেলের ভিতরটা একটা আজিব জায়গা জানো তো। যেন এই পৃথিবীটাতে একটা দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। একটা জেলের ভিতরের দুনিয়া, আরেকটা জেলের বাইরের। সেখানেও একটা জগত আছে। কত রকম লোক আছে। সবটাই কি অন্ধকার? তা তো নয়”।

অমলা বললেন, “ওসব কথা ভেবে মন খারাপ কোর না। বাদ দাও। ওই সময়টা ভুলে যাও। গ্রামের মানুষজনও তোমাকে ভরসা করে। নইলে সবাই তোমাকে এতটা বিশ্বাস করত না। গ্রাম ছাড়া হয়েও তো থাকতে হল না তোমাকে”।

প্রভাস বললেন, “আগে হলে তো ওরা পারত না। আগে পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে মেরুদন্ড ছিল। আগে ওরা গ্রামের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। এখন যারা পার্টি চালান, তাদের হয় বেশি বয়স হয়ে গেছে, নয়ত তাদের নিজেদেরই ঠিক নেই আদৌ পার্টি করবেন না পাল্টি খাবেন। এই জন্য এদের এত সাহস বেড়ে গেছে। রাজনীতিটা দুর্বল দলের জন্য না। শক্তিশালী হতে হয়, চোখে চোখ রেখে কথা বলার ক্ষমতা থাকার দরকার আছে। ক্ষমতা চলে গেল বলে সব ঘরে ঢুকে পড়ল, আমাদের মত মানুষদের নামে নকল কেস তৈরী করল অথচ কারও কোন হেলদোল নেই। বুড়ো নেতাগুলো সারাক্ষণ তত্ত্বকথা কপচে যাচ্ছে। ওরে তোদের কথা মানুষ শুনবে কেন? কাজের কাজ কিছু নেই, শুধু মুখে বড় বড় বাতেলা”।

অমলা বললেন, “বড় কষ্টে তুমি পার্টিটা ছাড়লে বল?”
প্রভাস ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, “আবার নাকি আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই তো সংগঠনের অবস্থা। খবরই রাখে না যে তার আগেই আমি দল পাল্টেছি। কিছু করার নেই গিন্নি, কিচ্ছু করার নেই”।
দরজায় ঠকঠক করল কেউ। প্রভাস সতর্ক গলায় বললেন, “কে?”
“আমি দাদা”।
আব্দুলের গলা। প্রভাস দরজা খুললেন। আব্দুল মুখে মাফলার বেঁধে এসেছে। ঘরে ঢুকে বলল, “ভোর ভোর এলাম তোমার সঙ্গে কথা বলতে। গ্রামের যা অবস্থা বুঝতেই পারছো”।
প্রভাস গম্ভীর গলায় বললেন, “বল কী বলার আছে”।
আব্দুল বলল, “দাদা, ঝামেলাটা কমবে না। বাড়বে। তোমাদের দল থেকে নাকি বিহারের দিক থেকে এক গাদা লোক পাঠাচ্ছে গ্রামে ঝামেলা করার জন্য। তুমিই পারো সামলাতে। নইলে দাঙ্গা লেগে যাবে দাদা”।
প্রভাস বললেন, “লাগলে লাগবে। আমি কী করতে পারি”?
আব্দুল বলল, “তুমি এই উপরের নেতাদের বল, এখানে ঝামেলাটা যেন না লাগায়। আমরা তো মিলে মিশেই ছিলাম, বল?”
প্রভাস বললেন, “মন্দিরে মাংস কে ফেলেছে বের কর, বাকিটা বুঝে নেব”।
আব্দুল বলল, “তুমি আবার এত ধর্ম নিয়ে মাততে শুরু করলে কবে থেকে?”
প্রভাস বললেন, “তুই তো হজে গেছিস আব্দুল। কমিউনিস্ট পার্টি করে নিয়মিত মসজিদেও যেতিস। আর আমি ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করলেই দোষ? যাক গে, তোর যা বলার বলেছিস, এবার আসতে পারিস”।
আব্দুল হাসার চেষ্টা করল, “তাড়িয়ে দিচ্ছো?”
প্রভাস বললেন, “তা মনে করলে তাই। যা তুই”।
আব্দুল বেরোল।
প্রভাস আব্দুলকে শুনিয়ে অমলাকে বললেন, “ঘরটা গঙ্গাজল দিয়ে মুছে নিও”।
আব্দুল যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়াল কথাটা শুনে।
প্রভাস চোখ মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলেন।
২৭।
তন্ময় গৌতমের চেম্বারে ঢুকে বলল, “গৌতমদা”।
গৌতম বললেন, “হু”।
তন্ময় বলল, “আসব?”
গৌতম বললেন, “আয়”।
তন্ময় বলল, “মল্লিকপুরে মারাত্মক ঝামেলা লেগেছে। আমি সেদিন অটোওয়ালাকে নাম্বার দিয়ে এসেছিলাম। সে ফোন করে জানাল, অনন্ত বাজপেয়ী বাইরে থেকে লোক নিয়ে গিয়ে মল্লিকপুরে হামলা করেছে। এদিকে এরাও বসে থাকে নি। তারাও লোক এনেছে। দুপক্ষে ব্যাপক বোমাবাজি, হাতাহাতি শুরু হয়েছে। এখন অবধি কী অবস্থা কেউ কিছু বলতে পারছে না। প্রশাসন রাস্তা আটকে দিয়েছে। মিডিয়াকে বলা হয়েছে পুরো ব্যাপারটাকে ব্ল্যাক আউট করে দিতে”।
গৌতম তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “নন্দনে বলিউড স্টার আসছে বুঝলি তন্ময়। নামটা ভুলে যাচ্ছি। বেশ ভাল অ্যাক্টিং করে লোকটা। তুই ওর একটা ইন্টারভিউ কর। সোনাঝুরি হোটেলে উঠেছে। আশা করি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবি”।
তন্ময় অবাক হয়ে গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, “মানে? তুমি শোন নি আমি যা বললাম? এটা ব্রেকিং নিউজ হতে পারে একটা”!

গৌতম বললেন, "ফোন নাম্বারটা তিয়াষার কাছে পেয়ে যাবি। আমি একটা ইম্পরট্যান্ট কাজ করছি। পরে কথা বলব। ওকে?"
তন্ময় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গৌতমের চেম্বার থেকে বেরোল। অনির্বাণ কম্পিউটারে কাজ করছিল। তন্ময় ওর পাশে বসে বলল, "এ ভাই"।
অনির্বাণ বলল, "কী হয়েছে?"
তন্ময় বলল, "এই সেদিন গৌতমদা কত লেকচার দিল না? আমাদের ফেক নিউজ নিয়ে কাজ করতে হবে, ট্রু নিউজ পাবলিশ করতে হবে এটসেট্রা?"
অনির্বাণ তন্ময়ের দিকে তাকাল, "হ্যাঁ, এই পরশুই তো বলল"।
তন্ময় বলল, "এখন আবার কী হল কে জানে! আমি বললাম মল্লিকপুরে হিন্দু মুসলমানে লেগে গেছে। মানে দুটো পার্টির পলিটিক্যাল ওয়ার হিন্দু মুসলমানের নামে চলছে আর কী, সেটা যেন গৌতমদা শুনতেই পেল না ভাই। আমাকে পাতি কাটিয়ে দিল"।
অনির্বাণ মুচকি হেসে বলল, "বুঝলি না?"
তন্ময় বলল, "কী বুঝতে হবে?"
অনির্বাণ হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, "নিশ্চয়ই উপর থেকে ইয়ে খেয়েছে। এই মার্কেটে নাকি উনি ফেক নিউজের এগেইন্সটে স্টোরি করবেন! তা যাক গে, কেসটা কী বল তো?"
তন্ময় চারদিকে তাকিয়ে বলল, "বাইরে চ"।
অনির্বাণ উঠল। দুজনে অফিসের স্মোকিং জোনে গিয়ে পৌঁছনোর পর তন্ময় একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "সেদিন অটোয়ালাটাকে নাম্বার দিয়ে এসেছিলাম না?"
অনির্বাণ বলল, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সে খবর দিল?"
তন্ময় বলল, "হ্যাঁ রে। মল্লিকপুরে ভাল ঝামেলা চলছে। এখন ইস্যু হয়েছে ওখানকার মন্দিরে গো মাংস ফেলা নিয়ে। কে বা কারা ফেলেছে, বা মাংসটা আদৌ গরুর নাকি নো ওয়ান নোজ। কিন্তু সেটাকে কেন্দ্র করে লেগে গেছে"।
অনির্বাণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওরে বাবা, সেটা তো বিরাট নিউজ। এটা জানার পরেও গৌতমদা কিছু বলল না?"
তন্ময় অনির্বাণকে সিগারেটটা কাউন্টার দিয়ে বলল, "বলল না তো। উলটে ইন্টারভিউ নিতে পাঠাচ্ছে সোনাঝুরিতে"।
অনির্বাণ চোখ বন্ধ করে সিগারেটে টান দিয়ে বলল, "লোক মরবে কমিউনাল টেনশনে। একটার পর একটা ঘটনা শুরু হয়েছে। আচ্ছা মানুষের কি বিচার বিবেচনাও চলে যাচ্ছে? কেউ একজন বলছে চিলে কান নিয়ে চলে যাচ্ছে, তো কান না দেখে চিলের পেছনে দৌড়চ্ছে? মাংস কেউ ফেললেই জায়গাটা অপবিত্র হয়ে গেল?"
তন্ময় বলল, "নিউজ না হোক অ্যাটলিস্ট গৌতমদার উচিত ছিল আমার থেকে খবরটা জেনে নেওয়া। কোন আগ্রহই দেখাল না মাইরি!"
অনির্বাণ বলল, "সিগারেটটা শেষ কর। দুজনে মিলে যাই একবার। দেখি কী বলে"।
তন্ময় বলল, "তাই চ"।
সিগারেটটা শেষ করে দুজনে গৌতমের ঘরে ঢুকল। গৌতম তাদের দেখে বলল, "তোদের কাজ নেই? জোড় বেঁধে ঘুরছিস কেন?"
অনির্বাণ বলল, "তোমাকে ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যেতে এলাম"।
গৌতম চোখ কুঁচকে বললেন, "মানে?"
অনির্বাণ বলল, "তন্ময়ের কাছে খবর পেলাম, তুমি নাকি কিছু শুনতেই পাচ্ছো না আজকাল?"

গৌতম একবার তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে অনির্বাণের দিকে ফিরে বললেন, "আমি যখন কিছু শুনতে না পাব, তখন তোদের সেটা না শোনাই মঙ্গল। তোরা নতুন তো, বড় দাদা হিসেবে জাস্ট একটা ছোট অ্যাডভাইস দিয়ে রাখলাম। আমাকে এর বেশি এক্সপ্লেইন করতে বলিস না। ক্লিয়ার?"
অনির্বাণ মুখ কালো করে বলল, "ক্লিয়ার"।

২৮।
দলের স্থানীয় কার্যালয়ে এসেছেন প্রত্যুষ। বিভিন্ন সার্টিফিকেটে সই করার থাকে। কয়েকজন বিভিন্ন আর্জি নিয়ে আসে, সেগুলো শুনতে হয়, যতটা পারেন সুরাহা করার চেষ্টা করেন।
বেশি লোক আসে নি। দলের ছেলে শম্ভু টিভি দেখছিল, প্রত্যুষ বললেন, "নিউজ চ্যানেল দে তো"।
শম্ভু নিউজ চ্যানেল দিল। টিভিতে দেখাচ্ছে সাগ্নিক প্রেস কনফারেন্স করছেন। পাশে কেন্দ্রের দলের তিন চারজন নেতা। প্রত্যুষ কয়েক সেকেন্ড দেখে টিভি বন্ধ করলেন। ফোন বাজছে। প্রবালদা ফোন করছেন। দলের উপরতলার নেতা। প্রত্যুষ ধরলেন, "হ্যাঁ বলুন"।
প্রবাল বললেন, "এই প্রত্যুষ, সাগ্নিক যে দল বদলাবে, তুমি জানতে? তোমরা তো খুব ক্লোজ ছিলে"।
প্রত্যুষ শম্ভুর দিকে তাকিয়ে ফোন নিয়ে অফিসের বাইরে গিয়ে বললেন, "না, আমাকে তো কিছুই বলে নি"।
প্রবাল চিন্তিত গলায় বললেন, "হুট করে চলে গেল। একবার তো বলতে পারতো! অদ্ভুত তো!"
প্রত্যুষের মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রসংগীতের একটা লাইন, "সে চলে গেল, বলে গেল না"।
প্রবাল স্বাস্থ্যবান লোক। অল্পে হাঁফিয়ে যান। দলের পাশাপাশি সরকারেরও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। দলের অনেক সিদ্ধান্ত তাকে আগে জানানো হয়। মাঝারি ও ছোট নেতারা সব সময় প্রবালের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। প্রবালের হাতে টিকিট দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তার সুপারিশে অনেকেই টিকিট পায়। তাই প্রবালকে সচরাচর কেউ চটায় না।
প্রত্যুষ বললেন, "আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করব প্রবালদা?"
প্রবাল হতাশ গলায় বললেন, "নাহ। আর যোগাযোগ করে কী হবে? তবে ও ফোন করলে আমাকে জানিও কী ব্যাপার। এই একদিন আগে মিটিং করছে, একদিন পরে দল পাল্টে ফেলছে, এ কি শপিং মলের জামা নাকি রে ভাই, পছন্দ না হলেই পাল্টে ফেলে দিচ্ছে? এরকম করলে দল ধরে রাখা যাবে? সব চোটপাট কিন্তু আমার উপর এসে পড়ছে। আমি আর পারছি না। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যাব এই বলে রাখলাম"।
ফোনটা কেটে গেল।
প্রত্যুষ সাগ্নিক হাজরাকে ফোন করলেন। ফোন প্রথমে রিং হতেই কেটে গেল। কয়েক মিনিট বাদে সাগ্নিক কল ব্যাক করে বললেন, "আরে ভাই বিরাট ব্যাপার। আমাকে মনে হচ্ছে স্টেট লেভেলের একটা ভাল পোর্টফোলিও দেবে। আমার অবশ্য ইচ্ছা এম পি হবার। আর সেটা রাজ্যসভা থেকে। এখন না হোক, ক্ষমতায় এসে দিক। অনেক দিন রাজনীতি করেছি। এখন আর ভোটে জিতে এম পি হতে ইচ্ছা করে না। যে দলে ছিলাম, আমরা পার্টি করে মরতাম আর উনি যত রাজনীতি না বোঝা ফিলিম স্টারদের এম পি করতে শুরু করছিলেন। অনেক হল"।
প্রত্যুষ বললেন, "হু, প্রবাল ফোন করেছিল"।
সাগ্নিক বললেন, "সে তো তোমাকে করবেই। তুমি আমার কাছের লোক না? জল মাপছে মালটা। তা কী বলল সে?"
প্রত্যুষ বললেন প্রবালের কথা।
সাগ্নিক বললেন, "ধুস। এ সব আঞ্চলিক পার্টির নেতার কথা শুনে চাপ নেওয়ার কোন মানেই নেই আর। আমি ভাবছিই না এদের নিয়ে। ছাড়ো তো। তাছাড়া এরা আমার কোন ক্ষতিও করতে পারবে না। দিল্লিতে

একটা স্পেশাল সুইচ আছে। সিবিয়াই সুইচ। সেটা টিপলেই এরা সব দম দেওয়া পুতুলের মত ঘুরতে শুরু করবে। তা যাক গে, তোমার কথা বল। এখানে বলব তোমার কথা?"

প্রত্যুষ বললেন, "আমি দুটো দিন দেখে যাই? কিছুদিন আগে একটা দল পাল্টে এলাম। আবার পাল্টাবো?"

সাগ্নিক বললেন, "আরে ধুর ভাই, পাবলিকের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। কেউ অত কিছু মনে রাখে নাকি। একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাদ দিয়ে বাকি মন্ত্রীদের নাম জিজ্ঞেস করে বেড়াও তো সাধারণ মানুষের কাছে? দেখো তো কেউ জবাব দিতে পারছে নাকি? ওসব ছাড়ো ভাই, তুমি চলে আসো। এদের ফান্ড অনেক স্ট্রং। ন্যাশনাল পার্টি, দেশ চালাচ্ছে। কী বলছি বুঝতে পারছো?"

প্রত্যুষ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "রাতে জানাই সাগ্নিকদা? কোন তাড়া আছে?"

সাগ্নিক বললেন, "না। কোন তাড়া নেই। তুমি সময় নাও। কিন্তু আই নিড ইওর পজিটিভ আনসার। ওকে?"

প্রত্যুষ হাসলেন, "ঠিক আছে দেখছি"।

#

ফোন রেখে প্রত্যুষ শম্ভুকে ডেকে বললেন, "এই শম্ভু, রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর নাম জানিস?"

শম্ভু মাথা চুলকাতে শুরু করল।

২৯।

শুভায়ু ফিরে দেখল ড্রইং রুমে সোফায় একজন অপরিচিত ছেলে শুয়ে আছে। সে ঘরের ভিতর গিয়ে অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

অঞ্জনা বলল, "টিভিতে দেখা যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটির ছাত্র নেতা। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে"।

শুভায়ু বলল, "কী নাম বল তো?"

অঞ্জনা বলল, "খলিল আহমেদ"।

শুভায়ু বলল, "যাহ বাবা, এ বাড়ির সন্ধান জানল কী করে?"

অঞ্জনা হাসল, "বাবা বলল ঢেকি দিল্লি এসে ধান ভানছে। এ সেই ব্যাপার ধরে নাও। ওদের এক বন্ধু রিসার্চের ব্যাপারে বাবার কাছে একদিন এসেছিল। সেই নিয়ে এসেছে। দেশদ্রোহিতার মামলা চলছে এই ছেলের উপর"।

শুভায়ু চিন্তিত মুখে খাটে বসে বলল, "সে ঠিক আছে, কিন্তু এখানে ও আছে, সেটা যদি পুলিশ জানতে পারে তাহলে ওর সঙ্গে আমাদেরও জেলে নিয়ে যাবে"।

অঞ্জনা শুভায়ুর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, "তাহলে কি তোমার খুব অসুবিধা হবে মিস্টার কমিউনিস্ট?"

শুভায়ু অঞ্জনাকে কাছে টেনে বলল, "তা হবে না, তবে কী জানো তো, জেলে নাকি মেল আর ফিমেল সেল আলাদা। সেক্ষেত্রে আমাকে আর তোমাকে ওরা আলাদা রাখবে, তখন আমাদের এই মহান প্রেমের কী হবে?"

অঞ্জনা শুভায়ুকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, "এই যাও তো। দরজা খোলা রেখে উত্তম সুচিত্রা খেলো না"।

শুভায়ু হাসতে হাসতে বলল, "তা ঠিক। আমি খলিলের সঙ্গে আলাপ করি গিয়ে। এক্সাইটিং লাগছে সিরিয়াসলি। ওর বক্তৃতা শুনেছো ইউটিউবে? গায়ের রক্ত গরম হয়ে যায়। এইটুকু ছেলে অথচ কী ঝকঝকে কথা বলে! ভাবতে পারবে না জাস্ট। আমি তো অলরেডি ব্যাটার ফ্যান। হি ইজ এ স্টার অঞ্জনা। ভাল করে খাওয়াবে। আমাদের কমরেড"।

অঞ্জনা বলল, "ওমনি কমরেড সত্ত্বা চলে এল তাই না?"

শুভায়ু বলল, "বাবা বলে দেখবে, কঠিন সময়ে মানুষ চেনা যায়। এই যে আমাদের রাজ্যে এত এত লোক কমিউনিস্ট পার্টি করত, সরকার পাল্টানোর আগে ক'টা লোক পাল্টি খেয়েছিল? যেই পরিবর্তন এল, ওমনি তারা দল পাল্টে পার্টি কত খারাপ ছিল সেই নিয়ে বাতেলা মারা শুরু করল। কঠিন সময়ে যারা থাকে,

তারাই কিন্তু আসলে ছিল। খলিলরা এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে দিল্লির মত জায়গায় এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ছাত্র রাজনীতি করছে কেন্দ্রীয় সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। এই তুমি ভাল কিছু রান্না কর আমি যাই"।
শুভায়ু উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে ড্রইং রুমে গেল।
খলিল শুয়ে ছিল। শুভায়ু যেতে উঠে বসল। শুভায়ু বলল, "টায়ার্ড লাগলে শুয়ে থাকো। কোন অসুবিধা নেই। ডিস্টার্ব করছি না তো?"
খলিল লাজুক মুখে বলল, "না না ডিস্টার্ব কেন করবেন? আপনাদের বাড়িতে আছি, আপনাদের তো ডিস্টার্বড হবার কথা"।
শুভায়ু বলল, "এ কেমন কথা? তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত। আমি তোমার বক্তব্য শুনেছি। এত ভাল বক্তা তুমি! দুর্ভাগ্য তোমার, এই ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে তোমাকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আবার সৌভাগ্যও অবশ্য। তুমি পালিয়ে থাকছো বলেই বুঝতে পারছো একজন কমিউনিস্টের জার্নিটা কত কঠিন হতে পারে"।
খলিল বলল, "ওরা কঠিন করে দিচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, তত কঠিন করে দিচ্ছে। নাজিমকে একদিন তুলে নিয়ে গেল জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে। তারপর থেকে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দু বছর হয়ে গেল। ওর মা এর ওর দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশে সব পার্টি করা যায়, কমিউনিস্ট পার্টি করা যাচ্ছে না। আমরাই ওদের সব থেকে বড় থ্রেট এখন"।
শুভায়ু বলল, "কবি থেকে শুরু করে বামপন্থী বুদ্ধিজীবি, ওদের লক্ষ্য সবাই। গৌরী লংকেশকে যেভাবে মারল, তা যেন কোন ইসলামিক কান্ট্রির ঘটনা। তোমার মনে থাকতে পারে বাংলাদেশী ব্লগার অভিজিৎ রায়কে ইসলামিক এক্সট্রিমিস্টরা কুপিয়ে মেরেছিল ধর্মের নামে। গৌরী লংকেশের হত্যাকান্ডও অনেকটা তাই। যাই হোক, বাড়িতে ফোন করেছো? খবর নিয়েছো?"
খলিল মাথা নাড়ল, "না, ওরা ফোন ট্যাপ করতে পারে। ওদের জারনালিস্ট কুকুরগুলো ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। আমার বাড়ির সামনে ওবি ভ্যান বসিয়ে দিয়েছে"।
শুভায়ু বলল, "তোমার বয়স কত খলিল?"
খলিল বলল, "ছাব্বিশ"।
শুভায়ু বলল, "বাহ, এইটুকু বয়সে তুমি দেশদ্রোহী হয়ে গেলে! ভাবা যায়? মনে সাহস রাখো। জয় আমাদের হবেই। বিশ্বাসটা রেখো"।
খলিল হাসল, "সেই বিশ্বাসটা নিয়েই তো বেঁচে আছি। একদিন আলো দেখবোই আমরা। দেখতেই হবে। আব্বু ছোট বয়সে মারা গেছিলেন। তারপর থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লড়াই করে যাচ্ছি। জিততে হবেই আমাদের। আমার সঙ্গে আমার দেশটাও যেন জেতে, এটুকুই চাইব"...

৩০।

বাড়ি ফেরার পথে প্রত্যুষ ঠিক করে রেখেছিলেন একবার ছেলের পেট্রোল পাম্প ঘুরে যাবেন। সাগ্নিকের কথাটা মাথায় ঘুরছিল বলে সে ইচ্ছা হল না। সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরে দেখলেন ভিজিটরস রুমে একজন বসে আছে।
তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, "কী ব্যাপার?"
"স্যার আমি রাজেশ শুক্লা। এই এলাকায় একটা আবাসন করতে চাইছিলাম। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল"।
প্রত্যুষের সকালের কথা মনে পড়ল। চেয়ারে বসে বললেন, "কোন কোন নেতা ধরার পরে আমার কাছে এলেন?"
রাজেশ জিভ কাটল, "ছি ছি, এসব কী কথা স্যার? আমি অতো ভেবে কিছু আসি নি। সরাসরি আপনার কাছেই এসেছি। আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা লোক। অত নেতা ধরাধরি করার ক্ষমতা আমার নেই।

একবারে লোন নিয়ে ব্যবসা স্যার”।
প্রত্যুষ বললেন, “ওকে। প্রোজেক্টটা বোঝান”।
রাজেশ ট্যাব বের করল। কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা ছবি বের করে বলল, “এখানে দুই একর জমি আছে। একটা পুকুর আছে সাইটে। আমরা পুকুরটাকে ইউজ করব। বোজাব না। ফলে এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। পার্ক হবে, সুইমিং পুল হবে, বোটিংও থাকবে, সব মিলিয়ে একবারে আলাদা ব্যাপার হবে”।
প্রত্যুষ কিছুক্ষণ মন দিয়ে ট্যাবটা দেখে বললেন, “কাগজপত্র? জমি কি আমাদের দখল করে দিতে হবে?”
রাজেশ বলল, “হ্যাঁ স্যার। সাইটের একটা অংশে একটা পার্টি অফিস পড়ছে প্রিভিয়াস রুলিং পার্টির। ওটাকে সরিয়ে দিতে হবে। অফিসটা বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। তবু যেহেতু ওটা পার্টি অফিস, পলিটিকাল ব্যাপার জড়িয়ে আছে, বুঝতেই পারছেন, আমাদের দ্বারা সেটা সম্ভব হবে না। তাই আপনার কাছে আসা”।
এতক্ষণে রাজেশের আগমনের কারণ প্রত্যুষের কাছে স্পষ্ট হল। তিনি বললেন, “দেখি কোন অফিসটা”।
রাজেশ ট্যাবটা এগিয়ে দিয়ে একটা ছবি বের করে বলল, “এই অফিসটা”।
ছবিটা দেখা মাত্র প্রত্যুষের একটা হার্ট বিট মিস হল। এই অফিস থেকেই তো তার উত্থান। একগাদা স্মৃতি জমে আছে। প্রথম ভোটে জেতা, লাল আবীর মাখিয়ে দিল তাকে এলাকার লোক জন। মাথায় করে কত নাচ সবার। সাইকেল ছিল সে সময়ে, দিন রাত সে অফিসটাতেই পড়ে থাকতেন। কত মিটিং মিছিলের শেষে অফিসে গিয়ে বসে এক কাপ লাল চা খেতেন সুজয়দার হাতে। কত রাত থেকে গেছেন এই অফিসটাতেই। ভেঙে ফেলতে হবে?
প্রত্যুষ বললেন, “এটা সত্যিই একটা পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল চলে আসছে। আমি কথা বলে জানাব আপনাকে?”
রাজেশ গলা নামিয়ে বলল, “আমি একটা ভিতরের খবর জানাই আপনাকে। এই পার্টির এখন যে সেক্রেটারি, তার সঙ্গে কথা হয়েছে। নতুন জমিতে ওদের জন্য অফিস করে দিলে কোন অসুবিধা নেই, এটুকু আপনাকে কনফার্ম করতে পারি”।
প্রত্যুষ ভ্রূ তুলে বললেন, “কী নাম সেক্রেটারির এখন?”
রাজেশ বলল, “অচিন্ত্য রাহা”।
প্রত্যুষ বললেন, “হু। এত সোজা বুঝি একটা অফিস ভেঙে দেওয়া, সব কিছু ভেঙে আরেকটা নতুন জায়গায় অফিস গড়ে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল? অচিন্ত্য নিজে সেটা আপনাকে বলে দিল?”
রাজেশ বলল, “হ্যাঁ স্যার”।
প্রত্যুষ বললেন, “অফিসটা বাদ দিয়ে একটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট জমা দিন। ও অফিস ভাঙা যাবে না”।
রাজেশ বলল, “স্যার, অচিন্ত্যবাবু কিন্তু রাজি ছিলেন। তাছাড়া অফিসটা বাদ দিলে অনেকটা জমি কমে যাবে। ওখানটা আমরা একটা জিমন্যাশিয়াম করব ভেবেছিলাম। কী হবে বলুন স্যার একটা ভাঙা পার্টি অফিস রেখে? এলাকাটাই তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। দেখুন না স্যার। আমি না হয় আপনার পার্টি ফান্ডে এক্সট্রা পাঁচ দিয়ে দেব। কুড়ির জায়গায় পঁচিশ দেব। কিছু করা যাবে না স্যার?”
প্রত্যুষ রাজেশের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, “অচিন্ত্যকে কত দিতে হয়েছে? ভয় নেই, আমি কাউকে বলব না, জাস্ট জানতে চাইছি”।
রাজেশ ইতস্তত করে বলল, “ওই তিন মত”।
প্রত্যুষ উঠে গিয়ে বেসিনে গিয়ে থুতু ফেলে এসে বললেন, “আপনি অফিসটা বাদ দিয়ে আমাকে প্রোজেক্ট প্রেমিসেসের ছবিটা পাঠান কালকে। ও অফিস ভাঙতে দেওয়া যাবে না”।
রাজেশ মুখ কালো করে চলে গেল।
৩১।

সাক্ষাৎকারের একটা মজা আছে। ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম যখন সে এসেছিল, তখন সাক্ষাৎকার দিতে যেমন ভাল লাগত, এখন ঠিক তার উল্টোটা হয়ে গেছে। ভীষণ একঘেয়ে, একই ধরণের প্রশ্ন।

তবু প্রদ্যুৎ রায় বড় নিউজপেপারের স্টার রিপোর্টার। তাকে মানা করা যায় না। আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রেখেছিলেন। ইন্টারভিউ শুরুই করলেন একটা বাউন্সার দিয়ে।

"তোমাকে যখন ঝিংকু মামণি নামে রিপ্রেসেন্ট করা হয়েছিল, কেমন লেগেছিল সোহিনী?"

প্রদ্যুৎ রায় সোহিনীকে প্রশ্নটা করে মৃদু হাসলেন।

সোহিনী বলল, "শুধু আমাকে করা হয় নি। অনেককেই করা হয়েছিল। ভাল লাগার তো কথা নয়"।

প্রদ্যুৎ বললেন, "সে কারণেই কি তুমি পরবর্তীকালে রাজনীতিতে এলে?"

সোহিনী বলল, "না। আমার বরাবরই মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছা ছিল। মূলত সে ইচ্ছা থেকেই রাজনীতিতে এসেছি"।

প্রদ্যুৎ রেকর্ডারটা অফ করে বললেন, "সিরিয়াসলি সোহিনী?"

সোহিনী হেসে দিল, "অন রেকর্ড তো অবশ্যই তাই। আমাকে যদি রাজনীতি করার জন্য যোগ্য বলে মনে করা হয়, তাহলে আমি আপত্তি জানাব না"।

প্রদ্যুৎ বললেন, "নট ব্যাড। তোমার বাবা শুনেছি বামপন্থী মানুষ। তিনি কীভাবে ব্যাপারটা দেখেছেন?"

সোহিনী বলল, "বাবার সঙ্গে পলিটিকস নিয়ে খুব বেশি কথা হয় না আমার। ভোটে জেতার পরেও সেভাবে কিছু কথা হয় নি"।

প্রদ্যুৎ বললেন, "তোমার কন্সটিটুয়েন্সিতে বেশ কিছু রাস্তা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। বিরোধীদের অভিযোগ ওই এলাকাগুলো বিরোধীরা ভোটে জিতেছিলেন বলে তুমি সেখানে রাস্তা করতে দিচ্ছো না। ইনফ্যাক্ট তোমাদের স্থানীয় নেতাদেরও সেরকমই মনোভাব। এ ব্যাপারে তোমার কী বক্তব্য?"

সোহিনী বলল, "ভোটে জেতার পরে আমি সব দলেরই জনপ্রতিনিধি। রাস্তা খারাপ থাকলে মানুষের ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি রাস্তাগুলো ঠিক করার"।

প্রদ্যুৎ বললেন, "বাহ, তুমি তো বেশ ঝানু পলিটিশিয়ান হয়ে যাচ্ছো। আমার মনে আছে, প্রথম যখন তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখলে, তোমার ফার্স্ট মুভিটা হিট করার পর আমিই তোমার ইন্টারভিউ করেছিলাম। তুমি বেশ নড়বড়ে ছিলে তখন। আই মাস্ট সে, ইউ হ্যাভ ইমপ্রুভড আ লট"।

সোহিনী কথা না বলে হাসল শুধু।

প্রদ্যুৎ বললেন, "দলে যখন কোন ঝামেলা হয়, সাপোজ কোন নেতা দল পাল্টাল, কিংবা ঘুষ খেতে গিয়ে ধরা পড়ল, তোমার কী প্রতিক্রিয়া হয় সে সময়? তখনও রাজনীতিটাকে এতটাই ভাল লাগে?"

সোহিনী বলল, "আমার মনে হয় কিছু কিছু জিনিসকে অবজ্ঞা করা উচিত। অবজ্ঞা না করতে পারলে নিজের উপর তার নেগেটিভ এফেক্ট পড়ে। আমি এই ঘটনাগুলো পুরোপুরি ইগনোর করি"।

প্রদ্যুৎ বললেন, "ইগনোর করা কি সব ক্ষেত্রে ঠিক? একজন মানুষ হিসেবে দুর্নীতিগ্রস্থদের সঙ্গে একই দলে থাকতে ভাল লাগে?"

সোহিনী প্রদ্যুতের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেব না। পরের প্রশ্ন করুন প্লিজ"।

প্রদ্যুৎ বললেন, "একজন মানুষ হিসেবে এইভাবে এড়িয়ে যেতে ভাল লাগে? যখন কেউ ঝিংকু মামণি বলে, আর তোমাদের পলিটিশিয়ান হিসেবে সেরকম গুরুত্ব না দিয়ে মজা করে, ভাল লাগে তখন?"

সোহিনী বলল, "কে গুরুত্ব দিল, আর কে দিল না সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার কাজ আমি করে যাব, এইটুকুই বলতে পারি। এর বেশি ভাবি না। আর আপনি যেটা বললেন, সেটা নিয়ে প্রথমে ভাবলাম জবাব দেব না, এখন মনে হল দিই। আমি মনে করি সব খানেই ভাল খারাপ থাকে। মিলিয়ে মিশিয়েই তো দল হয়। আমাদের দলও তার ব্যতিক্রম নয়। খারাপ কিছু হলে আমারও খারাপ লাগে। আর কিছু না"।

প্রদ্যুৎ আরও কিছু গতে বাঁধা প্রশ্ন করে গেলেন। সোহিনী ঠান্ডা মাথায় জবাব দিল।
প্রদ্যুত এবার হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের দলে শুনেছি ম্যাডামের কাছে তোমাদের নাম্বার বাড়ানোর কম্পিটিশন চলে তোমাদের মধ্যে। নিজেকে তুমি কোন জায়গায় দেখছো এই কম্পিটিশনে?"
সোহিনী বলল, "আমি কখনোই কোন কম্পিটিশনে বিশ্বাস করি নি, করবও না। আমাকে দেওয়া কাজ আমি ঠিকঠাক করতে পারলে বুঝব কিছুটা পেরেছি। দ্যাটস ইট"।
প্রদ্যুৎ ইন্টারভিউ শেষ করে বললেন, "বেশ ভাল বলেছো তুমি। আজকের মত উঠি?"
সোহিনী মনে মনে হাঁফ ছাড়ল, মুখে বলল, "নিশ্চয়ই। আবার দেখা হবে"।
প্রদ্যুৎ বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, "আচ্ছা সোহিনী, ভবতারিণীর অ্যাডে তুমি ছিলে, তাই না?"
সোহিনী বলল, "হ্যাঁ, ছিলাম। অত বুঝে তো তখন কিছু করি নি, আর পাঁচটা অ্যাডের মতই ওদের ট্রাভেল এজেন্সীর একটা অ্যাডে কাজ করেছিলাম। কেন বলুন তো?"
প্রদ্যুৎ বললেন, "না, মানে একটা কানাঘুষোয় যেন শুনছিলাম ইডি থেকে ডাকতে পারে যারা এইসব প্রচারের কাজে যুক্ত ছিল তাদের। শিওর না। কানাঘুষো মাত্র। আসি তবে"।
সোহিনীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রদ্যুৎ বেরিয়ে গেলেন।
৩২।
সন্ধ্যে গড়িয়েছে। তপন ফিরে দেখলেন শুভায়ু আর খলিল আড্ডায় মজেছে।
তিনি বসলেন। বললেন, "অনিন্দ্য ফোন করেছিল। খলিলকে সম্ভবত অজ্ঞাতবাসে এখানে কিছুদিন থাকতে হবে"।
শুভায়ু বলল, "আমি ওর জন্য কিছু জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করছি"।
তপন বললেন, "সে কর। কিন্তু এভাবে সোফায় শুতে অসুবিধা হচ্ছে না খলিল?"
খলিল বলল, "না না আংকেল। আমার অভ্যাস আছে। আমরা কী এমন বড় বাড়ির ছেলে? ইউপিতে হলে কি কোন মুসলমান ঘরের ছেলেকে হিন্দুরা রাখত?"
তপন বললেন, "ধুস, ওসব হিন্দু মুসলমান বা জাত পাত মানব বলে কি কমিউনিস্ট পার্টি করেছি? দেখো খলিল, আমি বা আমাদের বাড়ির কেউ তোমাকে সেরকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবে না এটুকু বলতে পারি। তোমার মত যুবদের এ রাষ্ট্র এভাবে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সেটাই বরং আমার কাছে দুর্ভাগ্য। অবশ্য আমি এ রাষ্ট্রের কাছে কোন দিনই এর বেশি কিছু আশা করি নি"।
শুভায়ু বলল, "আর তোমার পার্টির কাছে কী আশা করেছিলে বাবা?"
তপন থমকে গেলেন। শুভায়ুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "পার্টির কাছে আশা করেছিলাম আমরা একটা আদর্শ পরিস্থিতিতে থাকব। পরিস্থিতির এতটাই উন্নতি হবে যে কোন দিন ধর্মে ধর্মে বিভেদের কথা ভাবতেই পারব না। তার পরিবর্তে আমরা একশ্রেণীর সুবিধাবাদী শ্রেণী তৈরী করেছি। যারা শাসন থেকে সরে যাওয়া মাত্র দল বদলাতে দ্বিধাবোধ করল না। লালন করেছি এক শ্রেণীর সিউডো বুদ্ধিজীবীদের, যারা আমাদের থেকে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমাদের পিঠে ছুরি মারতে দুবার ভাবে নি। আমাদের শাসনকালে জাত পাত প্রথা রাজ্যের অনেক অংশে মানা হয়েছে। পণপ্রথা লুপ্ত হয় নি। বলতে শুরু করলে তালিকা শেষ হবার না। এর বিপরীতে বলা যায়, আমরা যে সময়ে ক্ষমতায় এসেছিলাম, তখন পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল। সে পরিস্থিতিকে ঠিক করতে সময় লেগেছে"।
শুভায়ু বলল, "আর পার্টি তোমায় এক্সপেল করবে, সেটাও আশা করেছিলে?"
তপন বললেন, "হ্যাঁ। আশা না করার কী আছে? বিচ্যুতি যখন হবে তখন সর্বত্র হবে। উই গট দ্য অপরচুনিটি টু শো দ্য ওয়ার্ল্ড বাইট উই ফেইল্ড মিজারেবলি। রাজ্যের চারদিকে হয়ে যাওয়া প্রতিটা হিন্দু

মুসলমান দাঙ্গায় বাকি পলিটিক্যাল পার্টিদের সঙ্গে উই আর ইকোয়ালি রেসপন্সিবল। আমরা সেই মানসিকতাটাকেই নারচার করতে পারি নি"।

খলিল বলল, "কিন্তু আংকেল, সমস্যাটা কী বলুন তো, ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে কমিউনিজম দুর্বল হয়ে পড়লে ভয়াবহ ক্ষতি হয়ে যাবে। গরীব মানুষের কথা ক্যাপিটালিস্টরা ভাববে না, ক্যাপিটালিস্টরা এই দেশকে মস্ত একটা বাজার হিসেবে দেখবে। আর এরা হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগিয়ে দেশের সব অ্যাসেটগুলো বেচে দেবে। জাস্ট ভাবুন আংকেল, দে আর গোইং টু সেল ইন্ডিয়ান রেইলওয়ে। মানে ট্রেনের টিকেটের দাম বেড়ে যাবে। এদেশের লাইফলাইন হল রেলওয়ে। সেটাকেই ওরা বেচে দেবে। এই সময় যদি কমিউনিস্টরা পাওয়ারফুল হত, সেটা পারত না"।

তপন বললেন, "সেটা কমিউনিস্টদেরও বুঝতে হবে। সত্যিকারের কমিউনিস্ট কোথায়? যারা কমিউনিজম চর্চা করতে চেয়েছিল, তাদেরও সেটা করতে দেওয়া হল না। আমার ছেলেকেই দেখে নাও। ওর ইচ্ছে ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায় কৃষক কিংবা শ্রমিকদের সঙ্গে থেকে কাজ করবে। তার পরিবর্তে ওকে করপোরেট জব করতে হচ্ছে। এটা কি শুধু ওর লস হল? দেশের লস না?"

খলিল বলল, "কেন করা গেল না?"

অঞ্জনা মুড়ি নিয়ে ঢুকল।

তপন বললেন, "করা গেল না কারণ দীর্ঘ কয়েক বছর ক্ষমতায় থেকে আমরা কমিউনিস্ট থেকে ক্যাপিটালিস্ট হয়ে উঠেছিলাম। আমরা আমাদের লোভটাকে অতিক্রম করতে না পেরে নিজের মানুষদেরই ব্যাক স্ট্যাব করতে শুরু করলাম। যাই হোক খলিল, নাও, মুড়ি খাও। এসব নিয়ে আর ভেবো না। ভেবে মন খারাপ ছাড়া আর কোন লাভ হবে না"।

শুভায়ু খলিলের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল।

৩৩।

"মুড়ি আনলাম, তুই পেঁয়াজটা কেটে নে"।

"কাটব কিন্তু ভাই পেঁয়াজে চোখ জ্বলে যায়"।

"ঠিক আছে, আমি কেটে নিচ্ছি"।

"সে তো বুঝলাম, কিন্তু মশা মারার কী ব্যবস্থা হবে?"

"ধুপ এনে দেব বলল তো"।

"এর থেকে তুই আমার বাড়িতে থাকতে পারতিস"।

"প্র্যাকটিস করতে হবে না?"

"হু। লেনিন বলেছিলেন প্র্যাকটিস মেকস এ ম্যান পারফেক্ট"।

"ভাগ! লেনিন এ কথা কবে বলেছিলেন?"

তপন আর প্রত্যুষ দুজনে হো হো করে হেসে উঠলেন।

রাত বাড়ছে। প্রত্যুষের ঘুম আসছে না। আগের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে জামা চেঞ্জ করে বাড়ির দরজা বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করলেন। রাস্তায় দু চারটে কুকুর তেড়ে এল। প্রত্যুষ পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে চললেন।

ভূতুড়ে বাড়ির মত ধুলোমাখা পার্টি অফিসটা দাঁড়িয়ে আছে। এই অফিসেই তো সেই মাঝরাত অবধি তর্ক বিতর্ক চলত। ক্লাস নিতেন নিতাইদা। প্রতিটা ক্লাস বুকে তুফান তুলত।

গণসঙ্গীত গাইতে আসত দেবযানী। সেখানেই তো দেখা হয়েছিল প্রথম!

"আহ্বান, শোন আহ্বান, আসে মাঠঘাট বন পেরিয়ে"!

সাইকেলগুলো এই কোণটায় সার বেঁধে রেখে ঢুকতেন সবাই। আলোচনা চলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মন্টু চা নিয়ে ঢুকছে। ভোটের সময় পতাকা, ফেস্টুন, রঙের টিনগুলো রাখা থাকত কোণের দিকে।

তিন লাখে এগুলো সব স্মৃতি হয়ে যাবে?
পুলিশের একটা টহলদারি জিপ এসে দাঁড়াল। তার কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে একজন কনস্টেবল চিৎকার করল, “এই, কে বে?”
প্রত্যুষ ফিরে তাকালেন। তাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “স্যার, আপনি এত রাতে? সব ঠিক আছে তো?”
প্রত্যুষ বললেন, “ঠিক আছে”।
গাড়িটা বেরিয়ে গেল।
প্রত্যুষ আবার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পথে রওনা দিলেন। দেবযানীকে কিচ্ছু দিতে পারেন নি বিয়েতে। বিবাহবার্ষিকীগুলো শুকনো যেত। এম এল এ হবার পর যে মাইনাটুকু পেতেন তাতে কোন মতে চলত। ছোট বাড়িটা বেড়েছে।
বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রত্যুষ। নিজেই নিজের প্রতি বিদ্রুপের হাসি হাসলেন। একেই বোধ হয় বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া। দু কামরার বাড়িটা এখন কলেবরে বেড়ে তিন তলা হয়েছে। প্রতিটা ঘরে এসি লেগেছে। যে দেবযানী এক সময় গরমকালে ফ্যান বন্ধ করে কাটিয়েছেন ইলেকট্রিক বিল বেশি এসে যাওয়ার ভয়ে, তিনি এখন এসি ছাড়া থাকতে পারেন না। ঘুষের টাকাগুলো এলে অবলীলায় গুণে গুণে তুলে রাখেন। সুভাষের কথা মনে পড়ল। সুভাষ কতবার তার বাড়ি এসেছে। ছেঁড়া জামা, দারিদ্র ফুটে উঠত চোখে মুখে। সেই ছেলে এখন দামী পারফিউম মাখে। বার বার তার কাছে তদ্বির করতে আসে পঞ্চায়েত প্রধান হতে চেয়ে।
তাদের চাহিদাগুলো আকাশছোঁয়া হয়ে গেল কবে থেকে যেন। মন্ত্রী হবার জন্য শুভায়ুকে ফাঁসালেন। ছেলেটা প্রত্যুষকাকু বলতে অজ্ঞান ছিল। বাবার চেয়েও তার সঙ্গে শুভায়ুর বেশি ভাব ছিল। কোন বই পড়ে ভাল লাগলে উত্তেজিত হয়ে ফোন করত তাকে। জন্মদিনে সুনীল গাঙ্গুলির “সেই সময়” দিয়েছিলেন। সেটা পড়ে টিফিনের টাকা জমিয়ে হুতোম প্যাঁচার নকশা কিনে আনল। মাঝরাতে সে বই পড়ে ফোন করল। প্রাচীন কলকাতা নিয়ে জানার কত আগ্রহ ছিল! এখনো শুভায়ুর সেই অবিশ্বাসে ভরা চোখটা তাকে তাড়া করে বেড়ায়।
“কৃষকের পাওনার জন্য রাজনীতি করতে হবে। শ্রমিকের হকের টাকা আদায় করতে হবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি চলবে না কমরেড! কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা লড়াই করব! একের পর এক দেশবিরোধী আইনের বিরোধিতা করতে হবে কমরেড। দেশ বাঁচাতে হবে। যেভাবেই হোক”। ট্রেড ইউনিয়নের মিটিঙে তার বক্তব্যগুলো প্রত্যুষের মনে পড়তে লাগল। কার পাওনা? কীসের পাওনা? ঝড়ের অনুদানের টাকাতেও নেতারা কাটমানি খায় দল মত নির্বিশেষে। লেনিন মূর্তি তো ভেঙেছে একটা মেশিন, আসল লেনিন মূর্তি সেই কবেই ভেঙে ফেলেছেন তারা। বহুদিন আগে।
প্রত্যুষ বাড়ির সামনে জনগণের জন্য নির্দিষ্ট বসার জায়গায় বসে সন্তুর নতুন গাড়িটার দিকে তাকালেন। চোদ্দ লাখ টাকার গাড়ি! এ দেশের না।
প্রথম সাইকেল কেনার দিনের কথা মনে পড়ে গেল। সারাদিন সাইকেল চালাচ্ছেন। পারলে সাইকেলটা মাথায় করে শুয়ে থাকেন।
তার নিজের বক্তৃতা মনে পড়ে গেল। “বিদেশী বাজার খুলে দেওয়া যাবে না, দেশের বাজারকে শক্তিশালী করতে হবে”।
সন্তুর গাড়িটা যেন বড় বড় চোখ করে তাকে দেখছে। সন্তু হবার পর একটা খেলনা গাড়ি কিনে দিয়েছিলেন মেলা থেকে। সেই গাড়ি নিয়ে সারাদিন খেলত। মুখ দিয়ে “ভুউউউউউ” করে শব্দ করে গাড়িটা নিয়ে ঘুরত ছেলেটা।
তিনি না হয় বিপথে চলে গেছেন, অচিন্ত্য তা বলে তিন লাখ নিয়ে অফিসটা সরাতে রাজি হয়ে গেল?
৩৪।

গ্রামের বেশিরভাগ বাড়ি জ্বলছে। পুলিশ লাঠিচার্জ করতে গিয়ে জনগণের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেছে। হাহাকারের শব্দ ভেসে আসছে।
নিজের ঘরে বসে ছিলেন প্রভাস। অমলা এসে বললেন, “মেয়ে বার বার ফোন করছে। চিন্তায় কান্নাকাটি করছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। কী বলব?”
প্রভাস বললেন, “অনন্তবাবুকে ফোন করছি। তোমাকে উনি ওর কাছে রেখে আসবেন”।
অমলা বললেন, “আর তুমি?”
প্রভাস বললেন, “আমার আর যাওয়া হবে না”।
অমলা বললেন, “তাহলে আমিও কোথাও যাব না”।
প্রভাস বললেন, “ছেলেমানুষী কোর না। এরকম অবস্থায় আমি গ্রাম ছেড়ে গেলে ওরা বলবে আমি পালিয়ে গেছি”।
অমলা বললেন, “পালিয়ে গেলে যাবে। যখন মিথ্যে কেস দিয়েছিল তখন কেউ এগিয়ে এসেছিল? তুমি ব্যবস্থা কর। বাড়ি ঘর জমি জিরেত থাক। আমরা এখন চলে যাই। পরে সব শান্ত হলে আসব”।
প্রভাস হেসে উঠে নিজের সাদা পাঞ্জাবীটা পরলেন। অমলা বললেন, “আমি তৈরী হব?”
প্রভাস বললেন, “আমি আসছি। অনন্তবাবু গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। তুমি চলে যেও”।
অমলা ভয় পেয়ে বললেন, “কোথায় যাবে?”
প্রভাস বললেন, “আসছি”।
অমলা বললেন, “না তুমি কোথাও যাবে না”।
প্রভাস বললেন, “ভেবো না”।
অমলাকে আর কিছু বলার সুযোগ না গিয়ে বাইক স্টার্ট দিয়ে গ্রামের দিকে এগোলেন প্রভাস। অমলা তার পিছন পিছন খানিকটা এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাইকের সঙ্গে দৌড়ে কি আর পারা যায়?
রাস্তার মধ্যে দাঁ, কুড়ুল পড়ে রয়েছে। রক্ত ছিটকে লেগে রয়েছে দেওয়ালে। কোন একটা জায়গা থেকে হৈ হৈ শব্দ আসছে।
প্রভাস বাইক নিয়ে সেদিকে এগোলেন।
গ্রামের মসজিদের সামনে ভিড় করে রয়েছে অনন্তর লোক। বেশ কয়েকজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের চোখে মুখে মারের ছাপ স্পষ্ট।
প্রভাসকে দেখে গ্রামের লোকেরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।
প্রভাস দেখলেন আব্দুল পড়ে আছে। মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।
একজন বলল, “হারিয়ে দিয়েছি দাদা ওদের। সব পালিয়েছে। আপনি না থাকলে হতই না। ভাগ্যিস বিহার থেকে লোক এনেছিলেন”।
প্রভাস বাইক রেখে আব্দুলের কাছে এগোলেন। আব্দুলের সামনে ঝুঁকে বসে পড়ে বললেন, “আব্দুল”।
আব্দুল চোখ খুলল কোন রকমে। প্রভাসকে বলল, “দাদা, বিশ্বাস কর, ওই মাংস আমি ফেলিনি। আমরা কেউ ফেলিনি”।
কয়েকজন রে রে করে আব্দুলকে মারতে এগোল।
প্রভাস হাত তুলে তাদের নিরস্ত করে বললেন, “আর আমার নামে যখন ভুয়ো মামলা দিয়েছিলিস?”
আব্দুল বলল, “আমি দিই নি দাদা। আমি কোন দিন দিই নি। আমি বাধা দিয়েছিলাম। ওদের বার বার বলেছিলাম এটা করিস না। ওরা শুনবে কেন বল? এ দলে আমি নতুন। আমার কথা শুনল না”। আব্দুল গুরুতর আহত। বাকিরাও। রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে চারদিক। মবে পরিণত হয়েছে সবাই। সব কিছু একদিনেই ধূলিসাৎ করতে হবে।
প্রভাস শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “এদের ছেড়ে দাও এবার। হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা কর”।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, “চুপ কর মাকুর বাচ্চা। আমরা জানতাম তো তুই এটাই করবি। তোরা যতই দল পাল্টাস, মাকুর বাচ্চা মাকুই থাকবে। চিরকাল মোল্লাচাটা হয়েই থাকবি তোরা। যখন আমাদের মন্দির ভেঙেছিল কোথায় ছিলি তোরা? আমাদের মেয়ে বউদের যখন তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করেছিল, কোথায় ছিলিস রে মাকুর বাচ্চা?”

প্রভাস বিস্মিত হলেন। এ কী? মানুষ তার কথা শুনছে না কেন আর? তিনি বললেন, “কে বলল?”

ভিড় থেকে আরেকজন চেঁচিয়ে উঠল, “যে এদের হয়ে কথা বলবে, তাকেও ছাড়ব না আমরা”।

চিৎকারটা বেড়ে গেল।

প্রভাস চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরা তার গ্রামেরই মানুষ। তাকে চেনে সবাই। কিন্তু এখন কেউ তার কোন কথা শুনছে না। উন্মত্ত হয়ে রয়েছে সবাই। বারুদটা ধিকিধিকি ছিল। আগুনটা তো তিনিই লাগিয়েছিলেন।

আব্দুলদের উপর প্রতিশোধ নিতে অনন্তর পরামর্শে পাঠার মাংস কিনে তিনিই তো লোক দিয়ে ভোর বেলা ফেলে ঝামেলার ব্যবস্থা করেছিলেন! এত দূর চলে গেছে ব্যাপারটা!

সবাই আব্দুলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রভাস চেষ্টা করলেন আটকাতে।

কিচ্ছু করতে পারলেন না।

৩৫।

সকাল হয়েছে। তপন ঘুম ভেঙে উঠে সামনের ঘরে গিয়ে দেখলেন খলিল কম্বল জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তপন। ছাত্র রাজনীতি করার জন্য আজকাল পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে! কী ভয়ংকর দিন আসছে।

খবরের কাগজ দিয়ে গেছে। খলিলের আরেক সহপাঠী রাজীব নিয়োগীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

খলিলকে পেলে নিশ্চয়ই আরো কঠিন ধারা আনবে। একে মুসলমান, তার ওপর খলিল তাদের পার্টি করে।

খলিল উঠে বসল, “ওহ আপনি উঠে গেছেন আঙ্কেল?”

তপন বললেন, “রাজীবকে আটক করেছে”।

কাগজটা এগিয়ে দিলেন তপন।

খলিল খবরটা মন দিয়ে কিছুক্ষণ দেখে বলল, “আমি সারেন্ডার করব আঙ্কেল। আমার কমরেড জেলে কষ্ট পাবে, আর আমি এভাবে লুকিয়ে থাকতে পারব না। কিছুতেই পারব না”।

তপন খলিলের চোখের দিকে তাকালেন। চোখের কোণে জল জমেছে ছেলেটার। আগুনও আছে চোখে। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, যারা এখনো বিশ্বাস করে এই পৃথিবীতে সব মানুষ সমান হবে। কারো কোন কষ্ট থাকবে না। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে মানুষ একে অপরের জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। যৌথখামার হবে। তারা স্বপ্ন দেখে এমন এক পৃথিবীর যেখানে ধারের টাকা শোধ করতে না পারার জন্য কোন কৃষক মহাজনের কাছে গলাধাক্কা খাবে না। আত্মহত্যা করবে না। কোন শ্রমিককে তার সর্বস্ব বিক্রি করতে হবে না।

তপন বললেন, “আমি অনিন্দ্যকে একবার জিজ্ঞেস করে নি। ও কী বলে দেখি”।

খলিল অস্থির হয়ে বলল, “ও আবার আটকাবে আমাকে”।

তপন বললেন, “তোমার আর রাজীবে ফারাক আছে খলিল। রাজীবকে আর যাই হোক পাকিস্তানী বলে নি। ওরা তোমার নাম পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দেখিয়ে দেবে। এই বয়সেই দেশটাকে আর ভালবাসতে ইচ্ছে করবে না তোমার”।

খলিল ম্লান হেসে বলল, “আমাদের গ্রামে এখনো ভারত পাকিস্তান ম্যাচে ভারত হারলে আমাদের গালাগাল করা হয় আঙ্কেল। ট্রেনে কোথাও গেলে আমরা এখন আর টিফিনে মাংস নিয়ে যাওয়ার সাহস পাই না। ভালবাসতে ইচ্ছা না করলে কোনদিনই করত না। এখনও সব কিছু পাল্টানোর স্বপ্ন দেখি। যে পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করবে তারাও তো এ দেশেরই নাগরিক। আমিও এ দেশের নাগরিক। কী আর হবে? খুব বেশি হলে আমার মা আর কোন দিন আমাকে দেখতে পাবে না। এই তো? কিন্তু এভাবে লুকিয়ে থেকে শুধু আপনাদের বিব্রত করা হবে। আমার কমরেড জেলখানায় মার খাবে আর আমি নিরাপদ আশ্রয়ে থাকব? তা হবে না”।

তপন বললেন, “চিন্তা কোর না। মনে রেখো মিথ্যে কোন কিছু বেশিদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। মানুষ যে দলই করুক, সত্যের পথে চললে কেউ কোন দিন তোমাকে হারাতে পারবে না। বাই দ্য ওয়ে, তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না। ব্রেকফাস্ট করে যেও”।

শুভায়ু উঠে পড়েছিল। বাইরের ঘরে এসে বলল, “কী হল বাবা? কী আলোচনা চলছে?”

তপন বললেন, “খলিল সারেন্ডার করতে চাইছে। ওর বন্ধুকে পুলিশ ধরেছে, ও আর এখানে থাকতে চাইছে না”।

শুভায়ু খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ে খলিলের দিকে তাকাল, “যে পরিস্থিতিই হোক, হার মেনো না। ওরা যদি তোমাকে দিয়ে উলটো পালটা কোন বয়ানে সই করিয়ে নিতে চায়, করবে না। ওরা বার বার তোমাকে দেশদ্রোহী প্রমাণের জন্য চাপ দিয়ে ওদের মন মত কোন বয়ান মানতে বলবে। মেনো না”।

তপন বললেন, “এত দেশদ্রোহী তৈরী করে কোন জেলে ভরবে এরা? একমাত্র এরাই দেশপ্রেমী? ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে অসৎ ব্যবসায়ীদের পালাতে সাহায্য করে সে টাকা সাধারণ গরীব মানুষের ওপর ট্যাক্সের মাধ্যমে তুলে এরা দেশপ্রেমী হবে? এত সহজে সব কিছু হবে না। তুই আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করেছিস না দেশে কমিউনিস্টদের কেন দরকার? এই জন্য দরকার। রাজনীতির জন্য না, দেশের গরীব মানুষের জন্য দরকার কমিউনিস্টদের। কমিউনিস্টের সংখ্যা যত কমতে থাকবে, গরীব মানুষেরা ততো বেশি বিপথে চালিত হবে”।

খলিল এক চোখ জল নিয়ে চুপ করে বসে রইল।

#

শ্যামলী দুপুরে বসে ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। অঞ্জনা ঘরে ঢুকে বলল, “ছেলেটা কেমন তড়িঘড়ি চলে গেল, বল?”

শ্যামলী অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওরা এরকমই হয়। আমার উনিও এরকমই ছিলেন। সারাক্ষণ পায়ের তলায় সর্ষে। কিছুতেই এক জায়গায় থিতু হতে পারত না। এখন কী করে চুপ করে সারাদিন এখানে থাকে, সেটাই ভাবি”।

অঞ্জনা বলল, “সেটা বুঝতে পারি। পুরোটাই অভিমানে। যে পার্টিকে এত ভালবাসলেন, সেই পার্টি যখন বের করে দেয়, তখন একটা লোক কী করবে?”

শ্যামলী শ্বাস ছাড়লেন, “সেই। কম তো করে নি দলটার জন্য।”

অঞ্জনা বললেন, “ছেলেটাকে দেখে কেমন মায়া হত মা। ওই টুকু গরীব ঘরের ছেলে, বাবা নেই, শুধু মা আছে। পড়াশুনা করে কতদূর এসেছে। মাথায় আবার দেশ পাল্টানোর ভূত। তোমার ছেলের মধ্যেও এরকম ভূত ছিল। কতটা পালটে গেল সব কিছু। একেকটা ঘটনা এক একটা মানুষের জীবনের গতি পালটে দেয়”।

শ্যামলী বললেন, “ আমার আজকাল মনে হয়, যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে। ওই তো ওর বাবার মতই হাল হত। যাদের জন্য সারাজীবন দেবে, তারাই ছুরি মারবে পেছন থেকে। মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। কতটা আঘাত পেলে একটা মানুষ নিজের হাতে তৈরী করা সব কিছু নির্দ্বিধায় ছেড়ে এখানে চলে আসতে পারে।

বাদ দাও, ছেলেটার জন্য মায়া হচ্ছে খুব। ভাল করে খেতেও পায় না বোধ হয়। আমি যা রাঁধতাম, সব কেমন সোনামুখ করে খেত। কী করবে এখন?"
অঞ্জনা বলল, "সারেন্ডার করবে বলে গেছে তো। পুলিশের কাছে যাবে। ওরা নিশ্চয়ই জেলে পাঠাবে"।
শ্যামলী বললেন, "জেলে পাঠাবার মত কত লোক আছে দেশে। অথচ যারা কিছু করে না, তাদেরই ধরার জন্য পুলিশ সব থেকে বেশি সক্রিয়। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। সোজা পথে চলা মানুষেরই শত্রু বেশি এখন!"
তপন ঘরে ঢুকলেন, "কী ব্যাপারে কথা হচ্ছে?"
অঞ্জনা বলল, "খলিলের ব্যাপারে। ছেলেটা কেমন তড়িঘড়ি চলে গেল বাবা।"
তপন বললেন, "একে বলে ফেলো ফিলিং। খলিল যখনই জানতে পারল ওর বন্ধুকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে অপরাধবোধ চলে এল। পড়ুয়াও বটে। এর মধ্যে দুটো বই পড়া শেষ করেছে। ভাল লাগছিল ওর সঙ্গে কথা বলে। এরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। যেটার কথা কেউ ভাবতেও পারবে না, সেটাই ওরা করে দেখাবে। শুভায়ুর মত ওকে যেন কেউ ডি মরালাইজ না করে এটাই চাইব। জীবন তো অতোটা সোজা না। সরলরেখায় জীবন চলে না। আমরা ভাবি এক, হয় আরেক। শুধুমাত্র আমাকে মন্ত্রী হতে দেবে না বলে আমারই বন্ধু আমার ছেলেকে নিয়ে যেটা করল, সেটাই প্রমাণ করে আমাদের দেশে রাজনীতি কতটা ভয়াবহ জায়গায় চলে গেছে। চেয়ারের লোভ মানুষের মনে জাঁকিয়ে বসেছে"।
শ্যামলী বললেন, " সব মিটে গেলে ছেলেটাকে একদিন ডেকো। পেট ভরে খাওয়াব ওকে। আলুপোস্ত করেছিলাম, কেমন চেটেপুটে খেল দেখলে?"
তপন বললেন, "গরীব ঘরের ছেলে। মেধার জোরে স্কলারশিপ পেয়ে পড়ে যাচ্ছে। টিউশন পড়ায়, পার্ট টাইমও পড়িয়েছে। এখন কেন্দ্রের মনে হয়েছে এরা এত শিক্ষিত মানুষ, এদিকে আমাদের তো সব ভুয়ো ডিগ্রি। পেটে কিল মারলে গাদাগুচ্ছের বাতেলা বেরোবে, বিদ্যে বেরোবে না কিছুই। তাই খলিলের মত ছেলেরা এদের স্বাভাবিক শত্রু। আমাদের দেশে চুরি ছ্যাচড়ামি করলে শাস্তি পাওয়া যায়, কিন্তু রাজনীতি এমন এক গঙ্গাজল যেখানে সব পাপ ধুয়ে যায়। যে নেতা ভবতারিণী কাহিনীতে ডাক পায়, সেই দেখি দল পালটে ফেলে। মানুষ এক টিমকে তাড়িয়ে আরেকটা টিমকে আনবে, যারা আরো ক্ষতিকারক। আরও ভয়াবহ"।
অঞ্জনা বলল, " ক্ষমতা পাল্টালে এই লোকগুলো আবার পালটি খাবে? প্রত্যুষকাকু কী করবেন? উনি কতবার দল পাল্টাবেন আর?"
প্রত্যুষের কথা শুনে তপনের চোয়াল শক্ত হল। তিনি বললেন, "থাক ওসব কথা। যে যেমন আছে, তেমনভাবে থাক। আমরা আমাদের মত থাকি। বাদ দাও"।

৩৬।
"দাদা"।
প্রত্যুষ চোখ খুলে দেখলেন সুভাষ ঝুঁকে আছে তার দিকে। বিরক্ত মুখে বললেন, "সকাল সকালে চলে এসেছিস? কী হয়েছে তোর?"
সুভাষ বলল, "কিছু করা গেল দাদা?"
প্রত্যুষ উঠে বসে বললেন, "সুভাষ আমাকে একটা কথা বলবি?"
সুভাষ বলল, "বল দাদা"।
প্রত্যুষ বললেন, "একটা কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের দাম কত হওয়া উচিত?"
সুভাষ অবাক হয়ে বলল, "কিছুই বুঝলাম না দাদা"।

প্রত্যুষ বললেন, "মানে আমাদের আগের দলের পার্টি অফিসের দাম কী রকম হতে পারে? তুই যেখানে পার্টি করেছিস, সেখানের অফিসটা বিক্রি হয়ে গেছে?"
সুভাষ বলল, "তালা বন্ধ থাকে দাদা। দাম কত হওয়া উচিত সেটা তো জানি না। কেউ আর খোলে না আজকাল। হয় সবাই পাল্টি মেরেছে, নয়ত পার্টি ছেড়ে দিয়েছে"।
প্রত্যুষ বললেন, "হুঁ"।
সুভাষ বলল, "তা দাদা আমার পঞ্চায়েত প্রধান..."
প্রত্যুষ চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেরো এখান থেকে। যা বলছি"।
সুভাষ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "রেগে যাচ্ছো কেন দাদা?"
প্রত্যুষ রাগী চোখে সুভাষের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এত ইন্টারেস্ট তোদের? এত ইচ্ছা? কী করবি তুই টাকা দিয়ে?"
সুভাষ বলল, "কুজোরও তো চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে দাদা। তুমিও তো দল পাল্টেছো। সব দোষ আমার হয়ে গেল? তুমি বল"।
প্রত্যুষ উঠে বাথরুমে গেলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সুভাষকে বললেন, "শোন সুভাষ। তোকে আমি একটা কথা বলি। আমি তোকে পঞ্চায়েত কেন, কোন প্রধানই করতে পারব না। আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইছি। তুই প্লিজ আমার কাছ থেকে কোন আশা করিস না"।
সুভাষ বিমর্ষ গলায় বলল, "পারবে না?"
প্রত্যুষ বললেন, "না। পারব না। তুই অন্য কাউকে ধর"।
সুভাষ মাথা চুলকে বলল, "কাকে ধরলে ভাল হয় তুমিই বলে দাও দাদা"।
প্রত্যুষ রাগী চোখে সুভাষের দিকে তাকিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলেন। রাজেশ শুক্লা এসে বসে আছে। তাকে দেখে হাতজোড় করে বলল, "দাদা, বলছিলাম কী আপনাকে আরো দশ এক্সট্রা দিই যদি, তাহলে পার্টি অফিসটা ভাঙা যাবে? মানে বুঝতেই পারছেন এতগুলো টাকা ইনভেস্ট করব, সাইট যদি মাঝখানে হঠাৎ করে বেঁকে যায়, তাহলে সমস্যায় পড়ে যাব?"
প্রত্যুষ বললেন , "আপনি এক কাজ করুন"।
রাজেশ আগ্রহী গলায় বলল, "বলুন দাদা"।
প্রত্যুষ বললেন, "আপনি অচিন্ত্যকে নিয়ে আসতে পারবেন?"
রাজেশ চিন্তিত মুখে বললেন, "রাতে নিয়ে আসি? সকালে যদি আসতে না চান?"
প্রত্যুষ বললেন, "ঠিক আসবে। ফোন করে আসতে বলুন"।
রাজেশ ফোন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকে বলল, "আসছে দাদা। ডিলটা তাহলে এখানেই ফাইনাল হয়ে যাবে? ভাল ব্যাপার বেশ"।
প্রত্যুষ উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অচিন্ত্য এল। তার থেকে বয়সে কুড়ি বছরের ছোট। প্রত্যুষ বললেন, "তা অচিন্ত্য, রাজেশের প্রস্তাবটা শুনেছো?"
অচিন্ত্য বলল, "হ্যাঁ, ওরা আমাদের একটা নতুন জায়গায় অফিসটাকে বানিয়ে দেবেন বলেছেন। তারপরে আর অরাজি হবার কোন কারণ দেখি নি"।
প্রত্যুষ বললেন, "তিন লাখেই রাজি হয়ে গেলে পুরো দলটাকে বেচে দিতে? লজ্জা লাগল না? তোমাদের মত সিউডো কমিউনিস্ট হবার থেকে আমাদের মত পাল্টিবাজেরা তো অনেক ভাল হে"।
অচিন্ত্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কখন সুভাষ তার পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "চেপে যান। দাদা কেমন পেগলে গেছে সকাল থেকে। কিছু বলার দরকার নেই এখন"।
অচিন্ত্য আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

প্রত্যুষ রাজেশকে বললেন, “আপনি অনেক কিছু করতে পারেন। আমাকে অ্যাভয়েড করে আমার উপর মহল থেকে স্যাংশান অর্ডার নিয়ে এসে আপনার প্রোজেক্টটাকে অ্যাপ্রুভ করাতে পারেন। কিন্তু আপনাকে আমি একটা কথাই বলব। আপনি ওই অফিসটাকে হাত দিলে একজনও যদি প্রতিবাদ করে, সেটা আমি হব। এমনভাবে কাজটা করুন, যাতে অফিসটা না লাগে। বোঝাতে পেরেছি?”
রাজেশ পাংশু মুখে মাথা নাড়ল।
৩৭।
“কী ব্যাপার রে ভাই, বিপ্লবী বেলুনটা এভাবে চুপসে গেল মাইরি”? স্মোকিং জোনে সিগারেটে একটা টান দিয়ে জিজ্ঞেস করল তন্ময়।
অনির্বাণ চারদিকে একবার দেখে নিল কেউ আছে নাকি। দেওয়ালেরও কান আছে। সাংবাদিকতার চাকরিতে হাওয়ারও কান থাকে। কোন রাজনৈতিক বিষয়ে রিপোর্টিং করতে গিয়ে এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়। আগেও হয়েছে। তবে সেসব ক্ষেত্রে গৌতমই তাদের বলে দিতেন কে চাপ দিয়েছে বা কোত্থেকে হুমকিটা এসেছে।
এক্ষেত্রে সেটা হয় নি। গৌতম একবারে চুপ মেরে গেছেন। তাদের দুজনকেই এড়িয়ে যাচ্ছেন।
অনির্বাণ বলল, “ভাল কোন জায়গা থেকেই যা খাবার খেয়েছে আর কী! বাদ দে”।
তন্ময় বলল, “মল্লিকপুরের হালত কিন্তু ভাল না। এই ধরণের ঘটনাগুলো ভীষণ অ্যালার্মিং। আমরা শহরে থেকে এর আঁচটুকু পাই না। মাঝে মাঝে আমি দুঃস্বপ্ন দেখি জানিস? মনে হয় যদি আমাদের শহরেও ওরকম ভয়ানক দাঙ্গা লেগে যায়? কী হবে বলত?”
অনির্বাণ মাথা নাড়ল, “না না। এখানে হবে না”।
তন্ময় বলল, “এই স্টেটে হবে, সেটা ভেবেছিলি কোন দিন? সেটা যখন ভাবিস নি, তাহলে শহরেরটাও হতে পারে। এভ্রিথিং ইজ পজিবল ইন দিস শিটি টাইম”।
অনির্বাণ মুখ কালো করে বলল, “ভয় লাগছে। মল্লিকপুরের ঘটনা দেখে ভয় লাগছে”।
তন্ময় বলল, “শুনেছি দেশভাগের সময় যে দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে শহরে রাস্তা ঘাটে লাশ পড়ে থাকত। যার ঘর পোড়ে সেই বোঝে”।
অনির্বাণ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, স্মোকিং জোনে গৌতম ঢুকলেন। সিগারেট ধরালেন এসে। তন্ময় অনির্বাণকে চোখের ইশারা করল। অনির্বাণ বলল, “গৌতমদা, আজকাল আমাদের অ্যাভয়েড করছো, কী ব্যাপার? নতুন কোন অ্যাসাইনমেন্ট দিলে না?”
গৌতম তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, “আই হ্যাভ রিজাইনড। নোটিস পিরিয়ডে আছি। বেশি কিছু বলার নেই কাউকে আর”।
অনির্বাণ আর তন্ময় দুজনেই চমকে উঠল। প্রায় একসঙ্গেই তাদের মুখ থেকে বেরোল, “সে কী?”
গৌতম মাথা নাড়লেন, “ইয়েস। লিভিং দিস সিটি। বেঙ্গালুরু মিররে জয়েন করছি”।
অনির্বাণ বলল, “ওখানে গিয়ে তুমি ফেক নিউজ বাস্টার কলামটা শুরু করবে?”
গৌতম কাঁধ ঝাঁকালেন, “করতেও পারি। কিচ্ছু ঠিক নেই”।
তন্ময় বলল, “হঠাৎ করে এত বড় ডিসিশন নিয়ে নিলে? তোমার মেয়ে কলকাতার স্কুলে পড়ে না? ওর পড়াশুনার কী হবে?”
গৌতম সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, “ম্যানেজ করে নেব। ওরা এখানেই থাকবে এখন। আমি যাব। পরে যদি সিচুয়েশন পারমিট করে তাহলে ওদের নিয়ে যাওয়া যাবে”।
তন্ময় বলে উঠল, “মল্লিকপুর নিয়ে আমরা আর কিচ্ছু লিখলাম না কেন গৌতমদা? এর জন্যই কি তুমি রেজিগনেশন দিলে? কোন রকম প্রেশার এসেছিল তোমার উপরে?”
গৌতম তন্ময়ের কথার উত্তর না দিয়ে চুপ চাপ সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন।

তন্ময় বলল, "আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু এরকমভাবে তোমাকে চুপ করে যেতে, বা আই র‍্যাদার সে, পালিয়ে যেতে কোন দিন দেখি নি তো, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম আর কী"!
গৌতম অনির্বাণের দিকে তাকালেন, "তারপর অনির্বাণ? বিয়ে করছিস কবে তুই?"
অনির্বাণ হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "করব। দেখি সামনেই"।
গৌতম প্রায় অর্ধেক সিগারেট পায়ের তলায় পিষে ফেলে বললেন, "বিয়েতে ডাকিস। চলে যাব যেখানেই থাকিস"।
অনির্বাণ বলল, "হ্যাঁ, ডাকব, শিওর"।
গৌতম দাঁড়ালেন না। স্মোকিং জোন থেকে বেরিয়ে গেলেন। তন্ময় থমথমে মুখে বলল, "দেখলি তো? কেমন বিহেভ করল? আমাদের পুরো গাছে তুলে নিয়ে মই কেড়ে নিল। সেদিনও সোশ্যাল টাইমসের ঋত্বিক আমার কাছে মল্লিকপুরের রিপোর্টটার ফলো আপ নিউজ জানতে চাইছিল। আমি বলতেই পারলাম না কিছু। এখন কেমন অসভ্যতা করে গেল? আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে বলি এই লোকটার এসব ফালতু কাজের কথা"।
অনির্বাণ বলল, "তুই এবারে বেশি চাপ নিয়ে নিচ্ছিস। থাম জাস্ট। এত ভাবিস না। গৌতমদা তো চলেই যাচ্ছে সব ছেড়ে। আর ওকে বলে কী হবে? কিছু কিছু জিনিসে এত থ্রেট থাকে, যেটা কাউকে বলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেরকম কিছু হবে"।
তন্ময় বলল, "আমাদের সঙ্গে শেয়ার করা উচিত ছিল যাই হোক না কেন"!
অনির্বাণ বলল, "ঠিক আছে। ভুলে যা। এসব নিয়ে মাথা খারাপ করে লাভ নেই"।
তন্ময় তবু থামল না। গজগজ করে যেতে লাগল।

৩৮।
একটা দুঃস্বপ্ন দেখে প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত সোহিনীর।
অনেকদিন পরে যেন সেই দুঃস্বপ্নটা ফিরে এল। সে কোন উঁচু জায়গায় সরু পথ দিয়ে হাঁটছে আর একটা জায়গায় গিয়ে সে পথ হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। সামনে পিছনে কিচ্ছু নেই। পরক্ষণেই সে উপর থেকে পড়ে যাচ্ছে।
ঘুম ভেঙে উঠে আলো জ্বালাল সোহিনী। কলকাতার ফ্ল্যাটে একা থাকা অভ্যাস তার বরাবরই। ঘড়ি দেখল। রাত দেড়টা বাজে। প্রদ্যুৎ রায় কী বলতে চাইল? আর পাঁচ জনের মত তাকেও ইডি ডেকে নিয়ে যাবে? জেরা করবে? সকাল বিকেল টিভিতে দেখাবে আর মানুষের কুমন্তব্যগুলো আবার তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলোতে আছড়ে পড়তে শুরু করবে?
ছোটবেলায় এরকম স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলে বাবাকে জড়িয়ে ধরে শুত সে।
খাটের পাশের টেবিলে বাবা মার ছবি আছে। অনেকক্ষণ সেটা দেখে কাঁদল সোহিনী। একটা সময় কত মানুষের অসভ্যতাকে তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে হারিয়ে দিয়েছে সে, অথচ তার নামে এত বড় অভিযোগ আসতে পারে? ভবতারিণীর প্রচারের কাজে যুক্ত মানে তো চিটফান্ডে টাকা ঢালার জন্য মানুষকে উস্কানি দেওয়া।
গোটা রাতটা ছটফট করে কাটল তার।
ভোর হতেই বিপুলকে ফোন করল সে। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর বিপুলের ফোন বাজল, "হ্যাঁ, কী ব্যাপার, এত সকালে?"
সোহিনী বলল, "বিপুলদা, একটা কথা শুনলাম। ভাবলাম তোমাকে একবার জিজ্ঞেস করে নি"।
বিপুল ঘুম গলায় বললেন, "বল কী ব্যাপার"।
সোহিনী বলল, "আমি যখন সক্রিয়ভাবে পলিটিক্সে আসি নি, তখন তুমি আমাকে বলেছিলে না ভবতারিণীর একটা অ্যাড আছে, কাজ করে দিতে হবে, আমি করেছিলাম। এখন শুনছি সেটার জন্য নাকি ইডি আমাকে

জেরা করতে পারে"।
বিপুল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বললেন, "আমি? আমি বলেছি? কোই, আমি কিছু বলি নি তো?"
সোহিনী অবাক হয়ে বলল, "তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে দাদা, তুমিই তো আমায় বলেছিলে। সেই কথামতই আমি অ্যাডটা করেছিলাম"।
বিপুল বললেন, "ভুল আমার না, তোমার হচ্ছে। তাছাড়া তুমি তো বাচ্চা নও। নিজে কোন অ্যাড করবে, সিনেমা বা সিরিয়াল করবে, সেগুলো কি আমাকে জিজ্ঞেস করে কর তুমি? রাখো এখন, কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছি"।
ফোনটা কেটে গেল।
মাথায় হাত দিল সোহিনী। বিপুলদা এভাবে পুরোপুরি অস্বীকার করে দিলেন? কীভাবে পারে কেউ এতটা?
শ্যুটিং ছিল সকালে। ক্যান্সেল করে দিয়ে ফ্ল্যাটেই কাটাবে মনস্থ করল সে। শীত লাগছিল খুব। মাথা কাজ করছিল না। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকল।
ফোনটা এল দুপুর বারোটা নাগাদ। সোহিনী দেখল সাগ্নিক হাজরা ফোন করছেন। ধরল সে, "হ্যালো"।
"হ্যাঁ সোহিনী ভাল আছো তো?"
সোহিনী বলল, "হ্যাঁ, ভাল আছি"।
"কাল প্রদ্যুৎ তোমায় কিছু বলেছে? ভবতারিণীর ব্যাপারটা নিয়ে?"
সোহিনী অবাক হল। প্রদ্যুৎ এই কথা সাগ্নিককে বলে দিয়েছেন? মানেটা বুঝল না সে। বলল, "হ্যাঁ, বলেছেন"।
সাগ্নিক বললেন, "খবরটা আমিই ওকে দিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে কাল সকালে ওর দেখা হয়েছিল, তখনই বলেছিলাম। ইডি কাদের কাদের ফোন করবে সে লিস্টটা তো আমি পরশু দেখেছি, তাতে তোমার নামটা দেখে একটু অবাকই হলাম। মানে বুঝছো তো, তুমি ক্লিন বরাবরই, সেখানে হঠাৎ করে তোমার নামটা দেখলাম"।
সোহিনীর মনে পড়ল সাগ্নিক এখন দল পাল্টেছে। কেন্দ্রের দলে থাকার অনেক সুবিধা। সব খবরই পাওয়া যায়।
সে বলল, "আচ্ছা"।
সাগ্নিক বললেন, "ইডিতে কেসগুলো যাওয়া মানে ভীষণ হ্যারাসমেন্ট, সেটা বুঝতে পারছো আশা করি। মানে দেখেছো তো একেকজনকে সকালে জেরা শুরু করছে, যখন ছাড়ছে সে সময় তার শরীরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকছে না। কাউকে কাউকে আবার ছাড়ছেও না। সরাসরি ভুবনেশ্বর পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি তোমার কথা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আজ সকালে বললাম। আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি বুঝলে? তুমি যে ক্লিন সেটা সবাই জানে। একটা ওয়ে আউট ওরা বলেছেন"।
সোহিনী বলল, "কী রকম ওয়ে আউট?"
সাগ্নিক বললেন, "জয়েন আস। একবারে দিল্লিতে এলাহী সাংবাদিক সম্মেলন করে জয়েন করানো হবে। আমাদের মহিলা কমিটির নেতৃত্ব দেবে তুমি। তোমাদের মত ইয়ং ফেসই তো আমরা চাইছি। আমাদের জয়েন করে যাও, বাকিটা আমরা বুঝে নেব। আরে এই দল আর থাকবে না রাজ্যে, এটুকু শিওর থাকো"।
সোহিনী কিছু বলল না। চুপ করে শুনে গেল।
আর তো কিছু করার নেই তার। কিচ্ছু করার নেই...

৩৯।
সন্ধ্যেবেলা।

তপন হেঁটে ফিরছিলেন, শুভায়ুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় দুজনে একসঙ্গে ফিরে দেখলেন অঞ্জনা আর শ্যামলী টিভি দেখছেন।
শ্যামলী বললেন, "ছেলেটার জন্য মন খারাপ লাগছে। কেমন মায়া পড়ে গেছিল। বাড়ি চলে গেল?"
তপন সোফায় বসে বললেন, "কারো কারো আর বাড়ি ফেরা হয়ে ওঠে না। আমাদেরই মত"।
শ্যামলী বুঝলেন না। বললেন, "মানে?"
শুভায়ু জুতো ছেড়ে এসে বসল, "মানে কিছু না মা। শুনলে মন খারাপ হবে। তোমার আর শুনে কাজ নেই"।
শ্যামলী বললেন, "থাক তবে। আমি মুড়ি মেখে আনি"।
অঞ্জনা বলল, "আমিও উঠি। নিউজ চ্যানেল দিয়ে যাব?"
তপন বললেন, "দাও। অবশ্য নিউজ কী আর দেখব! এখানে নিউজ মানে যেন কুস্তি লড়ছে। তাও দেখি"।
চ্যানেল পাল্টাল অঞ্জনা। তপন ঠিকই বলেছিলেন। সঞ্চালক লাফাচ্ছে। এই মুহূর্তের সব থেকে বড় ব্রেকিং নিউজ, পাকিস্তানের একজন গুপ্তচর, নাম খলিল আহমেদ, সে লুকিয়ে লুকিয়ে পাকিস্তানে দেশের ইন্টেলিজেন্স তথ্য পাচার করত, পুলিশ তাকে এনকাউন্টারে মেরে ফেলেছে। তার কাছ থেকে বেশ কয়েকটা গ্রেনেড আর অটোমেটিক মেশিনগান উদ্ধার করা হয়েছে।
শুভায়ু চেঁচিয়ে উঠল, "মানে? একী?"
তপন স্তম্ভিত হয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রিমোটটা নিয়ে টিভি বন্ধ করে দিলেন। তার ফোন বাজছিল। তপন ফোনটা ধরতে পারলেন না।
শুভায়ু মাথা চেপে বসে পড়ল।
তপন চুপ করে বসে রইলেন।
শুভায়ু কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে বলল, "বাবা, এটা কী হল? আমরা কি কিছুই করতে পারি না?
তপন ভাঙা গলায় বললেন, "আমার আটকানো উচিত ছিল ছেলেটাকে। বোঝা উচিত ছিল এটাই হতে পারে ওর জন্য। ওরা ওকে বাঁচতে দেবে না। একটা মেধাবী ছেলে, যার একমাত্র দোষ সে এই দেশের সংখ্যাগুরুর ধর্ম বিলং করে না, সে কীভাবে বেঁচে থাকবে?"
তপনের ফোনটা আবার বাজতে শুরু করল।
তপন ধরলেন, "হ্যালো"।
"হ্যালো স্যার। তপন রায় বলছেন?"
তপন গলা খাকড়িয়ে বললেন, "বলছি"।
"আমি ভিকের টিম থেকে বলছি স্যার"।
"ভিকে? বুঝলাম না"।
"স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা সমীক্ষা করছি গোটা রাজ্য জুড়ে। একটা মিশনে নেমেছি বলতে পারেন। আমাদের মিশন হল রাজ্যের অনেস্ট পলিটিশিয়ানদের আমাদের দলে আনা। এর পরিবর্তে আমরা ভাল প্যাকেজ অফার করছি স্যার"।
"আমাকে পরে ফোন করবেন? আমি একটু সমস্যায় আছি" ; তপন কোন মতে বললেন।
"শুনুন স্যার, প্লিজ, আমরা যে কোন সমস্যা সমাধান করতে পারি। আপনি আমাদের দলে যোগ দিলে আপনাকে আমরা শুধু ভাল পদই দেব না, আমরা তার পরিবর্তে আপনাকে এক কালীন একটা লাম্প সাম অ্যামাউন্টও দেব। স্যার আপনি শুধু বলুন আপনার কী চাই, একবার বলে দেখুন"। ও পাশ থেকে গলাটা ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করল।
তপন তার ডান হাত দিয়ে চোখে আসা জলটা মুছে নিয়ে বললেন, "আপনার নাম কী?"
"অভিজিৎ স্যার"।

"অভিজিৎ, আমি যা চাই আপনি দিতে পারবেন?"
"সারটেনলি স্যার। যে কোন অ্যামাউন্ট"।
"অ্যামাউন্ট চাই না অভিজিৎ। তার পরিবর্তে অন্য কিছু চাই"।
"বলুন না স্যার। উই শ্যাল ট্রাই আওয়ার বেস্ট"।
"এই জাস্ট কিছুক্ষণ আগে, একজন তরুণ মেধাবী ছাত্রকে আমাদের ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র মিথ্যে অভিযোগে গুলি করে মেরেছে। আপনি আমাদের দেশে সংবিধান বর্ণিত গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারবেন? যদি পারেন, তাহলে আমার আর কিচ্ছু লাগবে না। এমন কিছু কঠিন কাজ না জানেন তো, একেবারেই কঠিন কাজ না। দুটো জিনিস শুধু এনশিওর করতে হবে। এক, টাকার বিনিময়ে কোন পলিটিশিয়ান দল পাল্টাতে পারবে না, দুই, ভোটাররা নিজেদের ভাল বুঝে ভোট দিতে পারবে। কোন রকম গিমিক বা চমকে তারা পা দেবে না। পারবেন?"
"কী স্যার? কিচ্ছু বুঝলাম না স্যার"।
তপন চোখে জল নিয়েই হাসলেন, "ভাল থাকুন অভিজিৎ। আপনাদের রাজনীতির ব্যবসা নিয়ে আপনারা ভাল থাকুন। আমাকে রেহাই দিন"।
"স্যার, স্যার শুনুন স্যার, প্লিজ স্যার..."
ফোনটা কেটে দিলেন তপন।
রিমোটে হাতের চাপ লেগে টিভিটা আবার চলতে শুরু করে দিল। সাংবাদিক চেঁচাচ্ছে, দেশের জন্য একটা দারুণ গর্বের দিন আজ। একজন দারুণ সর্বনাশা সন্ত্রাসবাদীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা গেল...
#
সোহিনী করিডোর দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার পাশে প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছে। দুজন কেন্দ্রীয় পার্টিতে অফিশিয়ালি জয়েন করবে আজ।
মিডিয়া এসেছে। কেন্দ্রীয় নেতারা এসেছে।
প্রভাসের মুখে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। মুখ কালো করে হেঁটে চলেছেন।
সোহিনী অভিনেত্রী। সে জানে কী করে কষ্টের সময়েও অনুভূতি লুকিয়ে অভিনয় করে যেতে হয়।
একটু পরেই নতুন দলের পতাকা তাদের হাতে আসবে। ভাষণ তৈরী হয়ে গেছে। সোহিনী বলবে তার আগের দলের দুর্নীতির কথা। প্রভাস বলবেন রাজ্যে কীভাবে তোষণ ঘটছে সংখ্যালঘুদের। এ রাজ্যকে সোনায় মুড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা দল পরিবর্তন করতে এসেছেন।
পরিবর্তনের পরিবর্তন।
কোন কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নয়। পরিবর্তনও নয়।
শুধু সব পরিবর্তনই ভালর জন্যই হয় নাকি, সেটাই কেউ বুঝে উঠতে পারলেন না।
প্রভাস হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ করলে আব্দুলের কথা মনে পড়ল।
তার বাড়িতে পুজোর সময় প্রতিবছর আব্দুল ফুলের দায়িত্বে থাকত। পদ্ম খুঁজে নিয়ে আসত সন্ধিপুজোর সময়। অষ্টমীর দিন খিচুড়ি ভোগের দেখাশোনা, ভাসানের দিন ঠাকুরকে কাঁধে নিয়ে ভ্যানে তোলা, সব কাজ আব্দুল করত। ঈদে তাকে নতুন জামা কাপড় দিত আব্দুল। দল পাল্টেছিল যেদিন, খুব রেগে গেছিলেন প্রভাস। পরে এসে তার পায়ে ধরে পড়েছিল আব্দুল। বলেছিল, "দাদা, আমার কিছু করার নেই, ভাইটার চাকরির জন্য আমাকে করতে হল। মনে রাগ রেখো না"।
তবু ক্ষোভ ছিল প্রভাসের মনে।
মাঝে মাঝেই আজকাল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসেন প্রভাস। নিজের হাতে যেন আব্দুলের রক্ত দেখতে পান।
আব্দুল পাল্টেছিল, তার থেকেও বেশি পাল্টেছেন তিনি।

“ঠিক আছেন আপনি?”
সোহিনী জিজ্ঞেস করল।
প্রভাস চোখ খুললেন, “হ্যাঁ। চলুন”।
হাঁটতে শুরু করলেন প্রভাস। তার গ্রাম, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, আব্দুল, ধান কাটার সময়, সব পিছনে ফেলে...
#
সকালের কাগজ এসেছে। পাতায় পাতায় শুধু দল বদলের গল্প।
প্রত্যুষ কাগজটা নিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। সন্তু বেরোচ্ছে নতুন গাড়িতে করে। গলায় একটা প্ল্যাটিনামের চেন পরেছে।
সুভাষও এসেছে। এখনো কিছু বলে নি। কিছুক্ষণ পরেই হয়ত বলতে শুরু করবে তার দাবী দাওয়ার কথা।
রাজেশ শুক্লা তাকে ডিঙিয়ে পার্টি অফিস ভাঙার অ্যাপ্রুভাল নিয়ে এসেছে ঠিক।
বুলডোজার এগোচ্ছে ধীর গতিতে, তালা বন্ধ করা একটা অফিস আর অনেক স্মৃতি ঘেরা একটা ঘর ভেঙে দিতে।
অচিন্ত্য রাজেশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে...